মহাকবি ॥০॥

॥০॥ কালিদাস বিরচিত ॥০॥

বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান

খগেন্দ্রনাথ মিত্র অনূদিত

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী চিত্রিত

এ. কে. সরকার এণ্ড কোং
৬/১, বংকিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅধীরকুমার সরকার
এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

BATRISH PUTULER
UPAKHYAN
by Khagendranath Mitra

মুদ্রক :
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

পৃথিবীর সকল দেশেই লোকসাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু শিশুসাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে, মনে হয়। ভারতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। লোকসাহিত্য ও প্রাচীন শিশুসাহিত্য -রচয়িতারা লোকসমাজে অপরিচিত থাকলেও তাঁদের সৃষ্টিকাল অতিক্রম করে সামাজিক জীবনধারার পরিবর্তনের মধ্যেও বর্তমান থাকে। তবে তার বহিরঙ্গের কিছু পরিবর্তন ঘটে। লোকসাহিত্যের নানা বিষয়ের মধ্যে রূপকথা ও ছড়া অন্যতম। শিশুসাহিত্যেও এ দুটি আছে। কিন্তু অনেককে রূপকথা ও ছড়ামাত্রকেই শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে দেখা যায়। অথচ সকল রূপকথা ও ছড়া শিশুচিত্তোপযোগী নয়, যদিও লোকসাহিত্য শিশুসাহিত্যের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে একটি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উপজীব্য বিচারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ধরা অতি সহজ। যেমন কালে কালে লোকসাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে তেমনি প্রাচীনকাল থেকেই অলোকসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিক-গণও সময়ে সময়ে শিশুচিত্তবিনোদন ও তাদের সদুপদেশ-দানোদ্দেশ্যে কিছু কিছু কথাসাহিত্যও সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেশের বিষ্ণুশর্মাকৃত 'পঞ্চতন্ত্রে'র অতুলনীয় কাহিনীগুলি তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই সকল কাহিনী কেবল ভারতের রাজ্যে রাজ্যে স্থানীয় ভাষায় নয়, ভারতসীমা অতিক্রম করেও দেশ-দেশান্তরের অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং তথাকার বালক-বালিকাগণের আনন্দবর্ধন ও কল্যাণসাধন করছে।

কথিত হয়, মহাকবি কালিদাসও রাজকুমারের হিতার্থে বিষ্ণুশর্মার মতোই সংস্কৃতগদ্যে উপদেশমূলক কথাসাহিত্য রচনা করেন। যেমন পঞ্চতন্ত্রে তেমনি এই গ্রন্থখানিতেও উপদেশগুলি শ্লোকে উক্ত।

মহাকবি রচিত সেই 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' নামক গ্রন্থখানি বত্রিশটি ছোটবড় উপাখ্যানের সমষ্টি। উপাখ্যানগুলিতে রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের পরোপকার, দানশীলতা, ধৈর্য, আত্মত্যাগ, উদারতা প্রভৃতি সদগুণাবলীর এক একটিকে এক একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ করা হয়েছে। কাহিনীগুলি প্রাচীন সত্য, কিন্তু কাহিনীবর্ণিত সদগুণাবলী সর্বকালের, সর্ব সমাজের, সর্ব মানবের চরিত্রে থাকা বাঞ্ছনীয় একথা সকলেই স্বীকার করেন। কাজেই বলতে হয়, উপাখ্যানগুলি শাশ্বত সৃষ্টি। 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' আমাদের বাংলার অনুবাদ শিশু-সাহিত্যে 'বত্রিশ সিংহাসন' নামে প্রচলিত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কাহিনীগুলি একখানি সিংহাসনে খোদিত বত্রিশটি পুত্তলিকার মুখ দিয়ে উক্ত হয়েছে, 'বত্রিশখানি সিংহাসনের' নয়। সে কারণ মূলের দিকে লক্ষ্য রেখে এই অনূদিত গ্রন্থখানির নামকরণ করেছি 'বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান'। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থকে আধুনিক বাংলা ভাষায় অনুবাদে বিশেষ অসুবিধা। সংস্কৃতের গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব অনেক স্থলে রক্ষা করা যায় না। অপরদিকে গুরুগম্ভীর ভাষা বিশেষ করে শিশু-সাহিত্যের অনুপযোগী। এরূপ অসুবিধা সত্ত্বেও মূল গ্রন্থখানিকে সহজ চলিত বাংলায় অনুবাদ করেছি, শ্লোকগুলিকে গদ্যে রূপ দিয়েছি এবং অনাবশ্যক বা বালক-বালিকাদের অনুপযোগীবোধে মূলের কোন কোন অংশ, তবে স্বল্পই, পরিবর্জন না করা সমীচীন মনে করিনি। এজন্য উপাখ্যানগুলির রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিনা সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকাগণই বলতে পারবে।

পরিশেষে গ্রন্থখানির সাজসজ্জার কথা। গ্রন্থখানির অঙ্গসৌষ্ঠব ও সুন্দর চিত্রাবলী এর প্রধান বৈশিষ্ট্য যেজন্য আমার সহযোগী শিল্পীবন্ধু শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ধন্যবাদার্হ।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

।।০।। গোড়ার কথা ।।

একদিন কৈলাসশিখরে মহাদেব বসে আছেন। পার্বতী তাঁকে বললেন, "ভগবন্! পণ্ডিতগণ সময় কাটান বেদশাস্ত্রের আলোচনায়, মূর্খেরা সময় কাটায় ঘুমে আর কলহে। কাজেই সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে এমন কাহিনী বলা উচিত যা সকলের ভাল লাগে।"

মহাদেব বললেন, "দেবী! সকলের মনহরণ করে এমন কাহিনী বলছি, শোন।"

উজ্জয়িনী নামে এক নগর আছে। রূপে গুণে স্বর্গের অমরাবতীও তার কাছে পরাজিত। সেখানে ভর্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন।

তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্য ছিলেন সকল কলাবিছায় পরম পটু, সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত। তিনি নিজ পরাক্রমে শত্রুগণকে পরাভূত করেছিলেন। ভর্তৃহরির রানীর নাম ছিল অনঙ্গসেনা। সেই উজ্জয়িনী নগরে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ব্রাহ্মণটি ছিলেন সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত। সকল মন্ত্রই তাঁর জানা ছিল। মন্ত্রে তিনি ভুবনেশ্বরী দেবীকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন দরিদ্র।

দেবী একদিন সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়ে বলেন, আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট। বর প্রার্থনা কর।

ব্রাহ্মণ বলে, যদি আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমার যাতে রোগ-মৃত্যু না হয় তাই করুন।

দেবী তখন তাঁকে একটি স্বর্গীয় ফল দান করে বলেন, বৎস! তুমি ফলটি ভক্ষণ করো। তা হলে তোমার রোগ-মৃত্যু হবে না।

ব্রাহ্মণ ফলটি নিয়ে বাড়ি এলেন। তারপর দেব-পূজাদি শেষ করে ফলটি ভক্ষণ করতে যেতেই তাঁর মনে হলো, আমি দরিদ্র। অমর হয়ে কার কী উপকার করবো? অমর হলে বহুকাল জীবন ধারণ করে আমাকে ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে। তার চেয়ে যে পরের উপকার করতে পারে এই ফল তারই উপকার করবে। যে জীবনে ধর্ম, যশ লাভ হয় তাই প্রকৃত জীবন। কাক পূজার সামগ্রী খেয়ে অনেক দিন বাঁচে। তার জীবনে মঙ্গলকর কী আছে? কিন্তু যে বেঁচে থাকলে বহু লোকের প্রাণ রক্ষা হয়, তারই জীবনধারণ সার্থক। যিনি পরের উপকারকে নিজ স্বার্থ বলে মনে করেন তিনিই সাধুশিরোমণি।

ব্রাহ্মণ এমনি অনেক কথা মনে মনে আলোচনা করে স্থির করলেন, রাজাকে যদি ফলটি দান করি তাহলে তিনি রোগ-মৃত্যুহীন হয়ে সকলের উপকার করতে পারবেন।

এই স্থির করে ব্রাহ্মণ ফলটি নিয়ে রাজার কাছে গেলেন এবং

রাজাকে আশীর্বাদ করে রাজার হাতে ফলটি দিয়ে বললেন, ফলটি আমি দেবতার বরে পেয়েছি। আপনি অনুগ্রহ করে ফলটি ভক্ষণ করুন। তাহলে রোগ-মৃত্যুহীন হবেন।

রাজা ফলটি নিয়ে ব্রাহ্মণকে অনেক পুরস্কার দিয়ে বিদায় করলেন। তারপর মনে মনে আলোচনা করতে লাগলেন, এই ফলটি খেলে আমি অমর হব। অনঙ্গসেনাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। কাজেই ফলটি তাকেই দেব।

এই স্থির করে রাজা ভর্তৃহরি অনঙ্গসেনাকে ডেকে সেই ফল তাঁকেই দান করলেন। অনঙ্গসেনার আবার মথুরাদেশবাসী একটি প্রিয় পরিচারক ছিল। তিনি মনে মনে অনেক কথা ভেবে ফলটি দান করলেন তাকে। পরিচারক আবার এক দাসীকে ভালবাসতো। ফলটি সে তাকে দিলে। দাসী আবার ভালবাসতো এক রাখালকে। ফলটি সে দিলে তাকে। রাখাল ভালবাসতো এক ঘুঁটেওয়ালীকে। রাখাল ফলটি দিলে তাকে। ঘুঁটেওয়ালী গ্রামের বাইরে থেকে গোবর কুড়িয়ে ফলটি তার উপর রেখে গোবরের পাত্র মাথায় করে রাজপথে এসেই দেখে, রাজা ভর্তৃহরি রাজকুমারদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। রাজা ঘুঁটেওয়ালীর মাথায় গোবরের পাত্রের উপর ফলটি দেখেই সেটি নিয়ে রাজবাড়িতে ফিরে এলেন।

তারপর সেই ব্রাহ্মণকে ডাকিয়ে এনে জিগ্যেস করলেন, হে ব্রাহ্মণ! তুমি আমাকে যে ফল দান করেছিলে, তার মতো ফল আর আছে কী?

ব্রাহ্মণ বললেন, মহারাজ! দেবতার বরে সে ফল পেয়েছিলাম। সে রকমের ফল আর নেই।

রাজা বললেন, কোন স্ত্রীলোকের কাছে সেই ফল দেখলাম, এ কী করে সম্ভব?

ব্রাহ্মণ বললেন, আপনি কী সেই ফল ভক্ষণ করেছিলেন?

রাজা বললেন, না, আমি খাইনি, আমার প্রিয়তমা অনঙ্গসেনাকে দিয়েছিলাম।

ব্রাহ্মণ বললেন, তাঁকে জিগ্যেস করুন তিনি সে ফল কী করেছেন।

রাজা অনঙ্গসেনাকে ডাকিয়ে এনে তাঁকে শপথ করিয়ে জিগ্যেস করলেন, তুমি সেই ফল কী করেছো ?

রানী বললেন, মাথুরিককে দিয়েছি।

রাজা মাথুরিককে ডাকিয়ে এনে জিগ্যেস করায় সে বললে, ফলটি দাসীকে দেওয়া হয়েছে।

দাসীকে জিগ্যেস করলে সে বললে, রাখালকে দিয়েছি।

তখন রাখালকে জিগ্যেস করায় সে বললে, ফলটি আমি ঘুঁটেওয়ালীকে দিয়েছিলাম।

তাতে রাজা দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ বিক্রমাদিত্যকে রাজপদে অভিষিক্ত করে নিজে বনবাসে যাত্রা করলেন।

বিক্রমাদিত্য রাজা হলেন। খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি রাজ্য-শাসন করতে লাগলেন। তাঁর শাসনে রাজ্যের সকলেই সুখী ও সন্তুষ্ট হলো।

তারপর একদিন রাজসভায় এলেন এক দিগম্বর সাধু। তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যকে আশীর্বাদ করে তাঁর হাতে একটি ফল দিয়ে বললেন, মহারাজ! কৃষ্ণা চতুর্দশীতে আমি মহাশ্মশানে অঘোরমন্ত্রে (তান্ত্রিক আচারে) হোম করবো। সেখানে আপনাকে আমার উত্তরসাধকরূপে (সাহায্যকারীরূপে) উপস্থিত থাকতে হবে।

রাজা তাতে সম্মত হলেন। সন্ন্যাসী যথারীতি তাঁর কাজ শেষ করলেন। তাতে তাঁর অষ্টসিদ্ধি (আট রকমের অলৌকিক শক্তি) লাভ হলো। সে সময়ে পৃথিবীতে তাঁর সমান রাজা আর কেউ ছিলেন না।

এই সময়ে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনির তপস্যা ভঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে রম্ভা ও উর্বশীকে ডেকে বললেন, তোমাদের মধ্যে নৃত্যগীতে অপরের চেয়ে যে অধিক নিপুণা সে বিশ্বামিত্রের তপ ভঙ্গ করতে যাও। যে বিশ্বামিত্রের তপ ভঙ্গ করতে পারবে সে পুরস্কার লাভ করবে।

দেবরাজের কথা শুনে রম্ভা বললে, আমি নৃত্যগীতে খুব নিপুণ।

উর্বশী বললে, প্রভু! শাস্ত্রবিহিত নিয়মে আমি নৃত্য করতে জানি।

এইভাবে দুজনের মধ্যে কলহ আরম্ভ হলো। তা মীমাংসার উদ্দেশ্যে দেবরাজ স্বর্গে দেবগণের এক সভা ডাকলেন।

প্রথম দিনে রম্ভা নৃত্যগীত আরম্ভ করলো। দ্বিতীয় দিনে নৃত্য দেখালো উর্বশী। দুজনের নৃত্য দেখে দেবগণ খুশি হলেন। কিন্তু কে কার চেয়ে বেশি নিপুণা তা তাঁরা স্থির করতে পারলেন না।

তখন নারদ দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন, দেবরাজ! পৃথিবীতে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা আছেন। তিনি সকল কলাবিদ্যা জানেন, বিশেষ করে নৃত্যগীতে তাঁর জ্ঞান গভীর। তিনিই রম্ভা ও উর্বশীর কলহের মীমাংসা করে দেবেন।

তখন ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যকে আনতে মাতলিকে উজ্জয়িনীতে পাঠালেন। বিক্রমাদিত্য দেবরাজের আহ্বানে স্বর্গে গেলে দেবরাজ তাঁকে সসম্মানে বসালেন। তখন আবার নৃত্যের স্থান সুসজ্জিত করা হলো। প্রথমে রম্ভা সেখানে নৃত্য করলো। দ্বিতীয় দিন উর্বশী সেখানে শাস্ত্রের নিয়মানুসারে নৃত্য দেখালো। বিক্রমাদিত্য তাকে প্রশংসা করে তারই জয় ঘোষণা করলেন।

ইন্দ্র জিগ্যেস করলেন, উর্বশীর জয় হলো কেন?

বিক্রমাদিত্য বললেন, নৃত্যশাস্ত্রে লেখা আছে নৃত্যে অঙ্গসৌষ্ঠবই শ্রেষ্ঠ।

তারপর নৃত্যে অঙ্গসৌষ্ঠবাদি কেমন হওয়া প্রয়োজন তিনি তা বর্ণনা করে বললেন, শাস্ত্রে এই রকম যে সকল লক্ষণ কথিত আছে উর্বশীরও সে সকল লক্ষণ আছে। এই জন্যই আমি তার প্রশংসা করেছি।

এই কথা শুনে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বস্ত্রাদি দান করে তাঁর সম্মান আরও বৃদ্ধি করে তাঁকে রত্নখচিত মহামূল্য একখানি সিংহাসন দান করলেন। সেই সিংহাসনে বত্রিশটি পুতুল খোদাই করা ছিল। তাদের মস্তকে পদস্থাপন করে সিংহাসনে বসতে হয়। ইন্দ্রের আদেশে সেই সিংহাসন নিয়ে বিক্রমাদিত্য নিজ নগরে ফিরে এলেন। তারপর শুভলগ্নে শুভক্ষণে সেই সিংহাসনে বসে রাজ্য পালন করতে লাগলেন।

তারপর বহু বৎসর অতীত হলে প্রতিষ্ঠা নগরে আড়াই বৎসরের একটি কন্যার গর্ভে শেষনাগের ঔরসে শালিবাহন জন্মগ্রহণ করলেন। শালিবাহন যখন ভূমিষ্ঠ হন সেই সময়ে উজ্জয়িনীতে ভূমিকম্প, ধূমকেতুর উদয়, অগ্নিদাহ প্রভৃতি নানারকমের উৎপাত রাজা-প্রজা সকলেরই চোখে পড়তে লাগলো।

তখন বিক্রমাদিত্য দৈবজ্ঞগণকে আনিয়ে জিগ্যেস করলেন, রাজা-প্রজা সকলেই ঐ সকল উৎপাত দেখছেন কেন? এর ফল কী? কারই বা অনিষ্ট সূচনা করছে?

দৈবজ্ঞেরা বললেন, মহারাজ! যখন সন্ধ্যাকালে ভূমিকম্প হয়েছে, তখন রাজার পক্ষেই অনিষ্ট সূচনা করছে। ধূমকেতুর উদয় রাজার জীবনহানি সূচক; দিক-অগ্নি হলুদ রঙের হলে রাজার পক্ষে আশঙ্কার।

রাজা বিক্রমাদিত্য দৈবজ্ঞের কথা শুনে আবার বললেন, হে দৈবজ্ঞ! আমি যখন তপস্যায় ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করি তখন তিনি প্রসন্ন হয়ে বলেন, 'রাজন! আমি প্রসন্ন হলাম, তুমি শর্তানুসারে অমরত্ব প্রার্থনা কর।' আমি তাঁকে বলি, 'দেব! যখন আড়াই বৎসরের কন্যার গর্ভে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে তার হাতেই যেন আমার মৃত্যু হয়, অন্যের হাতে যেন আমার মৃত্যু না ঘটে।' ঈশ্বর 'তথাস্তু' বলে বর প্রদান করেন। সুতরাং সেরূপ পুত্রের জন্ম কোথায় হবে?

দৈবজ্ঞ বলেন, রাজন! দেবতার সৃষ্টির কথা কিছুই বলা যায় না। কোন দেশে জন্মগ্রহণ করতেও পারে এবং দেখাও সম্ভব।

তাই শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালকে ডাকিয়ে এনে তাকে সমস্ত জানিয়ে বললেন, হে যক্ষ! তুমি পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে দেখ কোথায় কোন্ নগরে ঐ রকম পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছে। নিশ্চিত ভাবে তা জেনে শীঘ্র ফিরে এস।

তারপর বেতাল 'আপনার আদেশ শিরোধার্য' বলে রাজার হাত থেকে পানের খিলি নিয়ে কুশিদ্বীপাদি নানাস্থান ঘুরে শেষে জম্বুদ্বীপে প্রতিষ্ঠা নগরে উপস্থিত হলো। সেখানে এক কুম্ভকারের বাড়ি গিয়ে দেখলো, এক বালক আর সোনার পুতুলের মতো একটি মেয়ে খেলা করছে।

তাই দেখে বেতাল তাদের জিগ্যেস করলো, তোমাদের দুজনের সম্বন্ধ কী?

মেয়েটি বালকটিকে দেখিয়ে বললে, এটি আমার পুত্র।

বেতাল জিগ্যেস করলো, তোমার পিতা কে?

তখন মেয়েটি এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে দিল।

বেতাল ব্রাহ্মণকে জিগ্যেস করলো, মেয়েটি আপনার কে?

ব্রাহ্মণটি বললেন, এটি আমার মেয়ে আর এই শিশুটি আমারই ঐ মেয়ের সন্তান।

তাই শুনে বেতালের বিস্ময়ের সীমা রইলো না। সে ব্রাহ্মণকে আবার জিগ্যেস করলো, এ কী করে সম্ভব হলো?

ব্রাহ্মণ বললেন, দেবচরিত্র বোঝা মানুষের বুদ্ধির অসাধ্য। এই শিশুটির পিতা নাগরাজ শেষ। বালকটির নাম শালিবাহন।

এই কথা শোনামাত্র বেতাল উজ্জয়িনীতে ফিরে এসে বিক্রমাদিত্যকে সকল কথা জানালো। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালকে পুরস্কার দান করে স্বয়ং প্রতিষ্ঠা নগরে যাত্রা করলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে যথাস্থানে গিয়ে যেমনি অসির আঘাতে শালিবাহনকে বধ করতে উদ্যত হলেন অমনি শালিবাহন তাঁকে দণ্ডাঘাত করলেন। সেই আঘাতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রতিষ্ঠা নগর থেকে একেবারে উজ্জয়িনীতে এসে পড়লেন। সেই আঘাতের বেদনা সহ্য করতে না পেরে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর পত্নীগণ তাঁর সঙ্গে পুড়ে মরতে উদ্যত হলেন।

তখন মন্ত্রিগণ বিচার করে দেখলেন, রাজার কোন পুত্র নেই। এখন কী কর্তব্য?

ভট্টি বললেন, রাজপত্নীগণের মধ্যে কেউ গর্ভবতী আছেন কিনা দেখুন।

অনুসন্ধানে দেখা গেল এক রানী সাতমাস গর্ভবতী। তখন সেই গর্ভের অভিষেক করে মন্ত্রিগণ প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

একদিন সভায় দৈববাণী শোনা গেল, হে মন্ত্রিগণ! এই

সিংহাসনে বসে স্বয়ং রাজ্যশাসন করতে পারেন, এমন উপযুক্ত রাজা নেই। অতএব এই সিংহাসন কোন সুস্থানে ফেলে দিন।

এই দৈববাণী শুনে মন্ত্রিগণ সিংহাসনখানি সুস্থানে ফেলে দিলেন।

তারপর বহু বৎসর কেটে গেল। শেষে ভোজরাজ রাজ্য লাভ করে শাসন করতে লাগলেন। যেখানে সিংহাসনখানি ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেখানে এক সময়ে কোন ব্রাহ্মণ শস্যক্ষেত তৈরি করে যব বুনলেন। তাতে প্রচুর শস্য জন্মালো। যেখানে সিংহাসন ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গাটি ক্ষেতের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। তাই দেখে ব্রাহ্মণ পাখি তাড়াবার উদ্দেশ্যে সেখানে একটি মঞ্চ তৈরি করে তার উপর বসে পাখি তাড়াতেন।

একদিন ভোজরাজ রাজকুমারগণের সঙ্গে ভ্রমণ করতে করতে যেমন সেই ক্ষেতের কাছে এলেন অমনি ব্রাহ্মণ বললেন, রাজন্, এই ক্ষেতে ঠিকমতো শস্য জন্মেছে। আপনি সসৈন্যে এসে যথেচ্ছ ভোগ করুন, ঘোড়াগুলোকেও দানা খেতে দিন। আজ আমার জন্ম সার্থক হলো। আপনি আমার অতিথিরূপে এসেছেন। এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটে।

রাজা ব্রাহ্মণের কথা শুনে সসৈন্যে ক্ষেতে প্রবেশ করলেন।

তখন ব্রাহ্মণ মঞ্চ থেকে নেমে রাজাকে বললেন, রাজন্! কেন এমন অধর্মাচরণ করছেন? আপনি ব্রাহ্মণের এই ক্ষেতটিকে নষ্ট করছেন। কেউ অন্যায় করলে সে সম্বন্ধে আপনার কাছেই নালিশ করা হয়। এখন আপনিই অন্যায় আচরণ করছেন। সুতরাং কে আপনাকে বাধা দেবে? শাস্ত্রে বলে—মদমত্ত হস্তী, ব্যভিচারিণী রানী আর পাপাচারী বিদ্বান্‌কে কে বাধা দিতে পারে? আপনি ধর্মশাস্ত্র জানেন, তবু ব্রাহ্মণের সামগ্রী এই ক্ষেত কেন নষ্ট করছেন? ব্রাহ্মণের সামগ্রী বিষম। ধর্মশাস্ত্রে বলে, বিষকে বিষ বলে না, ব্রহ্মস্বই বিষ। বিষ একজনকে বিনাশ করে, কিন্তু ব্রহ্মস্ব পুত্র-পৌত্র সকলকেই বিনাশ করে।

ব্রাহ্মণ রাজাকে এই কথা বললে, তিনি সকলকে নিয়ে যেমনি ক্ষেত থেকে বার হয়ে এলেন ব্রাহ্মণ পাখি তাড়াবার জন্য আবার সেই মঞ্চে উঠে বসলেন। আবার সেখান থেকে রাজাকে ডেকে বললেন, রাজন্! চলে যাচ্ছেন কেন? এই ক্ষেতে প্রচুর শস্য জন্মেছে। আপনার ঘোড়াগুলো ক্ষেতের যবের ডাঁটাগুলো খাক, কাঁকুড় ফলেছে, তাও খাক।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা সানুচর আবার সেই ক্ষেতে যেমনি প্রবেশ করলেন অমনি ব্রাহ্মণ মঞ্চ থেকে নেমে রাজাকে আগের মতো কথা বলতে লাগলেন।

তখন রাজা মনে মনে ভাবলেন, কী আশ্চর্য! যখন এই ব্রাহ্মণ ঐ মঞ্চে আরোহণ করেন তখন এঁর মনে দান ও ভোগ এই বুদ্ধির উদয় হয়, আবার যখন মঞ্চ থেকে অবতীর্ণ হন তখন মনে দীন বুদ্ধি দেখা দেয়। অতএব আমি ঐ মঞ্চে উঠে দেখবো। এই স্থির করে রাজা সেই মঞ্চে আরোহণ করলেন। অমনি রাজার মনে এই বাসনার উদয় হলো—জগতের দুঃখ দূর করা কর্তব্য। সকল লোকেরই দারিদ্র্য দূর করা উচিত। দুষ্টকে শাস্তি দান, সাধুকে পালন করা, এবং ধর্মানুসারে প্রজাকুলকে রক্ষা করা উচিত। বেশি কী, এখন কেউ যদি আমার দেহ প্রার্থনা করে, আমি তাও দান করি।

রাজা এইভাবে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এই ক্ষেতখানিই আমার মনে এই প্রকার বুদ্ধির উদয় করেছে। শাস্ত্রে বলে, জলে তেল পড়লে, খল ব্যক্তির কাছে গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করলে, সৎপাত্রে সামান্য পরিমাণও দান করলে, বুদ্ধিমান লোককে শাস্ত্র শিক্ষা দিলে বস্তুর নিজ শক্তিতে তা ছড়িয়ে পড়ে। যা হোক, এখন কী উপায়ে এই ক্ষেতের মাহাত্ম্য জানতে পারি?

মনে মনে এই সকল কথা ভেবে রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, হে বিপ্র! এই ক্ষেত থেকে আপনার কী পরিমাণ লাভ হয়?

ব্রাহ্মণ বললেন, রাজন্। আপনি সকল বিষয়ের মীমাংসায় সক্ষম। আপনার অজানা কিছুই নেই। বিবেচনায় যা মনে হয় তাই করুন।

তখন রাজা ব্রাহ্মণকে ধনধান্যাদি দানে সন্তুষ্ট করে সেই ক্ষেত তাঁর কাছ থেকে নিয়ে মঞ্চের তলা খোঁড়াতে আরম্ভ করলেন। এক মানুষ সমান গর্ত হতেই সুন্দর একখানি পাথর দেখা গেল। দেখলেন সেই পাথরখানির তলায় চন্দ্রকান্ত শিলায় তৈরি নানা-রত্ন-খচিত বত্রিশটি মূর্তি বসানো একখানি অতি সুন্দর স্বর্গীয় সিংহাসন রয়েছে। সিংহাসনখানি দেখে রাজার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হলো। তিনি সিংহাসনখানি গ্রামের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তা খুব ভারী বোধ হতে লাগলো, নড়াতে পারলেন না। তখন মন্ত্রীকে বললেন, মন্ত্রি! এই সিংহাসন নড়াতে পারা যাচ্ছে না কেন?

মন্ত্রী বললেন, রাজন্! এই সিংহাসন স্বর্গীয় ও অপূর্ব। বলি, হোম ও পূজা-অর্চনা ছাড়া এই সিংহাসনকে নড়ানো যাবে না। নড়াতে আপনার শক্তিও নেই।

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা ব্রাহ্মণগণকে ডেকে তাঁদের দিয়ে সমস্ত কাজ করালেন। তখন সেই সিংহাসন হাল্কা হয়ে আপনি চলতে লাগলো। তাই দেখে রাজা মন্ত্রীকে বললেন, মন্ত্রি! এই সিংহাসন ঠেলে নিয়ে যেতে প্রথমে আমার সামর্থ্য হয় নি, কিন্তু তোমার বুদ্ধির গুণে এখন আমার হস্তগত হয়েছে। বুদ্ধিমানের সংসর্গ সুখের কারণ হয়।

মন্ত্রী বললেন, রাজন্! যিনি স্বয়ং বুদ্ধিমান, কিন্তু পরের বুদ্ধি শোনেন না, তাঁর বিনাশ হয়! আপনি সে প্রকৃতির মানুষ নন।

রাজা বললেন, যিনি অনর্থ নিবারণ ও আগামী কার্য সাধন করেন, তিনিই মন্ত্রী। শাস্ত্রে বলে, যিনি উপস্থিত কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে, ভবিষ্যৎ কার্যের সম্ভাবনায় ও অনর্থকর ক্রিয়ার নিবারণের উদ্দেশ্যে বুদ্ধির সঙ্গে উপায় উদ্ভাবন করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী!

মন্ত্রী বললেন, রাজন্! প্রভুর মঙ্গলসাধন করাই মন্ত্রীর কর্তব্য। যাঁদের মন্ত্রণা কার্য অনুসরণ করে এবং কার্য প্রভুর কল্যাণের উদ্দেশ্যে সাধিত হয়, তাঁরাই রাজমন্ত্রী হবার যোগ্য। মহারাজ! রাজার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক আপনাতে সে সমস্তই আছে; আপনি রাজমণ্ডলীর মধ্যে অগ্রণী। অনিষ্টকর কার্য থেকে রাজাকে নিবারণ মন্ত্রীর অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে একটি। নন্দরাজার মন্ত্রীর বহু জ্ঞান ছিল। তার ফলে তিনি ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করেছিলেন।

রাজা জিগ্যেস করলেন, সে কী রকম?

মন্ত্রী বললেন, রাজন্! বলছি শুনুন। বিশালা নামক নগরে নন্দনামে মহাশক্তিমান এক রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম জয়পাল, মন্ত্রীর নাম বহুশ্রুত, পত্নীর নাম ভানুমতী। মন্ত্রী বহুশ্রুত ছয় প্রকার দণ্ডশাস্ত্রবিদ্যা জানতেন। ভানুমতী রাজার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রাজা যখন সিংহাসনে বসতেন তখন ভানুমতী তাঁর বাঁ দিকে অর্ধাঙ্গে থাকতেন। তিনি মুহূর্তকালও ভানুমতীকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। একদিন মন্ত্রী মনে মনে ভাবলেন 'এই রাজা নির্লজ্জের মতো সভামধ্যে পত্নীকে নিয়ে সিংহাসনে বসেন। সকলেই রানীকে দেখে। এ অত্যন্ত অনুচিত।' তিনি একদিন অবসর বুঝে রাজাকে বললেন, মহারাজ! আপনার কাছে একটি বিষয় নিবেদন করবার আছে।

রাজা বললেন, কী, বল।

মন্ত্রী বললেন, অসূর্যম্পশ্যা ভানুমতী যে আপনার সঙ্গে সভামধ্যে বসেন, শাস্ত্রকারেরা বলেন, এ অনুচিত। নানারকমের লোক এসে তাঁকে দেখে।

রাজা বললেন, সবই জানি। কিন্তু কী করি? এই ভানুমতীতে আমি অত্যন্ত অনুরক্ত। একে ছেড়ে আমি ক্ষণকালও থাকতে পারি না।

মন্ত্রী বললেন, তাহলে এক কাজ করুন।

রাজা বললেন, কী করবো, স্থির করো।

মন্ত্রী বললেন, চিত্রকরকে ডেকে তাকে দিয়ে ভানুমতীর একখানি ছবি আঁকিয়ে নিন। সেই ছবি সামনের দেয়ালে আটকে রেখে সর্বদা তাঁর রূপ দেখুন।

রাজার মনে হলো মন্ত্রীর কথা ঠিক। তিনি চিত্রকরকে আহ্বান করে বললেন, তুমি ভানুমতীর মূর্তি ছবিতে এঁকে দাও।

চিত্রকর বললে, আমি তাঁকে চোখে দেখলে ঠিকমতো এঁকে দিতে পারি।

তাই শুনে রাজা ভানুমতীকে আহ্বান করে চিত্রকরকে দেখালেন।

চিত্রকর রানীকে দেখে বুঝলো যে, এই নারী পদ্মিনী রমণীর লক্ষণে সুশোভিতা। তখন সে পদ্মিনী-লক্ষণযুক্তা ভানুমতীর ছবি এঁকে রাজার হাতে দিল। রাজা ছবিখানি দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুরস্কার দিলেন।

তারপর রাজগুরু শারদানন্দ এসে চিত্রপটে ভানুমতীর মূর্তি দেখে বললেন, ওহে চিত্রকর! ভানুমতীর সকল লক্ষণই তুমি চিত্রিত করেছো। কিন্তু একটি মাত্র চিহ্ন আঁকতে তোমার ভুল হয়েছে।

চিত্রকর বললে, প্রভু! কী ভুল হয়েছে বলুন।

তখন শারদানন্দ বললেন, ভানুমতীর বাম উরুতে তিলকাকার একটি মৎস্যচিহ্ন আছে, তুমি সেটি চিত্রে আঁক নি।

শারদানন্দের এই কথা শুনে রাজা এক সময়ে রানীর বাম জঘন পরীক্ষা করে দেখলেন, সত্য সত্যই তিলকাকার একটি মৎস্যচিহ্ন রয়েছে। তাই দেখে রাজা চিন্তা করলেন, ভানুমতীর এই চিহ্ন শারদানন্দের চোখে পড়লো কেমন করে? নিশ্চয় এর সঙ্গে শারদানন্দের সংযোগ ঘটেছে। না হলে সে কেমন করে এটা জানতে পারবে? এমনি নানা কথা মনে ভেবে রাজা মন্ত্রীকে সকল কথা বললেন।

মন্ত্রীও সেই সময়ে রাজার সঙ্গে একমত হয়ে বললেন, রাজন্! কার মনে কি আছে, কে বুঝতে পারে? আপনি যা বললেন তা সত্য হলেও হতে পারে।

রাজা বললেন, মন্ত্রি! তুমি যদি আমার প্রিয়পাত্র হও তাহলে শারদানন্দকে বধ কর।

মন্ত্রী 'তাই হবে' বলে সকলের সামনে শারদানন্দকে বন্দী করলেন।

তখন শারদানন্দ বললেন, লোকে যে বলে, রাজা কখনও কারো প্রীতিপাত্র হন না, একথা সত্য। শাস্ত্রেও বলে, কোন্ ব্যক্তি অর্থশালী হয়ে গর্বিত না হয়? কোন্ বিষয়ী ব্যক্তির আপদ না ঘটে? কোন্ ব্যক্তি বা রাজার প্রিয় হয়? কোন্ ব্যক্তি না কালের অধীন? কোন্ ব্যক্তি বা দুর্জনের কূটজালে বদ্ধ হয়ে কল্যাণের সঙ্গে পরিত্রাণ পায়? শাস্ত্রে বলে, রাজকোষে পতিত হলে পবিত্র অপবিত্র, পটু অপটু, বীর ভীরু, দীর্ঘায়ু অল্পায়ু এবং সৎকুলজ কুলহীন হয়।

তারপর মন্ত্রী যখন শারদানন্দকে নিয়ে বধ্যভূমিতে গেলেন, তখন শারদানন্দ এই শ্লোক আবৃত্তি করলেন, বনে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শত্রুর কাছে, জলমধ্যে, অগ্নিমধ্যে, মহাসাগরে, পর্বতশিখরে, প্রমত্ত বা বিপজ্জনক অবস্থায় মানুষ যেমনই থাকুক পূর্বের পুণ্য তাকে রক্ষা করে।

তখন মন্ত্রী মনে মনে চিন্তা করলেন, ব্যাপারটি সত্য হোক বা মিথ্যা হোক আমি ব্রহ্মহত্যা করি কেন? কাজটি করা নিতান্ত অনুচিত।

এই ভেবে তিনি অন্যের অজ্ঞাতসারে শারদানন্দকে গুপ্ত ভবনে নিয়ে গিয়ে ভূনিম্নের কক্ষে রেখে রাজার কাছে এসে বললেন, মহারাজ! আপনার আজ্ঞা পালন করা হয়েছে।

রাজা বললেন, ভাল করেছো।

তারপর রাজকুমার একদিন মৃগয়া করতে বনে গেলেন। যাত্রাকালে নানারকমের অমঙ্গলচিহ্ন দেখা গেল।

মন্ত্রিপুত্র বুদ্ধিসাগর তখন রাজকুমারকে বললেন, জয়পাল! আজ মৃগয়ায় যাত্রা করো না। অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

জয়পাল বললেন, এমন দুর্লক্ষণে আমার বিশ্বাস নেই।

মন্ত্রিপুত্র বললেন, রাজকুমার! এমন অহিতকর দুর্লক্ষণে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্তব্য।

রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রের নিষেধ উপেক্ষা করে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

যাত্রাকালে মন্ত্রিপুত্র আবার বললেন, জয়পাল! তোমার জীবননাশ হবার সময় এসেছে। না হলে এমন বুদ্ধির উদয় হবে কেন? কেউ কখন সোনার হরিণ দেখে নি, কেউ কখন তা পায়ও নি বা তার কথা কেউ কখন শোনে নি। তবু সোনার হরিণ ধরবার বাসনা শ্রীরামের মনে জাগলো। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধির উদয় হয়।

তারপর রাজকুমার বনে গিয়ে বহু হিংস্র পশু বধ করলেন। তারপর একটি কৃষ্ণসার হরিণ দেখে তাকে বধ করবার উদ্দেশ্যে তার পিছনে যেতে যেতে দেখলেন, তিনি গহন বনে এসে পড়েছেন। সৈন্যেরা সকলে নগরের পথে চলে গেছে। সঙ্গে কেউ নেই। সেই সময়ে কৃষ্ণসারও অদৃশ্য। রাজকুমার একাকী অশ্বপৃষ্ঠে বনে ঘুরতে ঘুরতে একটি সরোবরের ধারে এসে পড়লেন। সেখানে ঘোড়া থেকে নেমে তাকে জল খাইয়ে ও গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে যেমন একটি গাছতলায় গিয়ে বসলেন, অমনি সেখানে ভয়ঙ্করমূর্তি এক বাঘ এলো।

বাঘ দেখে ঘোড়াটি দড়ি ছিঁড়ে নগরের দিকে ছুটলো। রাজকুমারও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একটি গাছের ডাল ধরে গাছটিতে

চড়লেন। ইতিপূর্বে একটি ভালুকও সেই গাছে চড়ে বসে ছিল। তাকে দেখে রাজকুমার আবার আরও বেশি ভয় পেলেন।

তখন ভালুক বললে, রাজকুমার, তোমার ভয় নেই। আজ তুমি আমার শরণ নিয়েছো। সুতরাং আমি তোমার একটুও অনিষ্ট করবো না। আমাকে বিশ্বাস করো। ঐ বাঘের জন্যে তোমার কোন ভয় নেই।

রাজপুত্র বললেন, ভালুকরাজ! আমি তোমার শরণাগত। অত্যন্ত ভয় পেয়েছি। অতএব শরণাগতকে রক্ষা করলে তোমার মহাপুণ্য হবে। শাস্ত্রে বলে, একদিকে সহস্র দক্ষিণা দান করে যে যজ্ঞ, অন্যদিকে প্রাণভয়ে ভীত যে তার জীবন রক্ষা, এই দুটি কাজের ফল একই।

ভালুকের আশ্বাসে রাজপুত্র আশ্বস্ত হলেন। এমন সময়ে সেই বাঘও গাছটির তলায় এসে পড়লো। আর সূর্যও অস্ত গেল। অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়ার ফলে রাজপুত্রের ঘুম আসতে লাগলো। তখন ভালুক বললে, রাজকুমার! তুমি ঘুমের ঘোরে গাছ থেকে পড়ে যাবে। আমার কোলে এসে ঘুমোও।

তাই শুনে রাজকুমার ভালুকের কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তখন বাঘ ভালুককে ডেকে বললে, হে ভালুক! ঐ লোকটা গ্রামবাসী। আবার কখন বনে মৃগয়ায় এসে আমাদের বধ করতে পারে। লোকটা শত্রু। কেন ওকে কোলে করে রেখেছো? কারণ ও মানুষ। বাঘ, বানর ও সাপেদের কাজ-কর্মের কথা বলছি না, পক্ষী জাতীয় প্রাণীকেও যে-সব কাজ করতে দেখা যায় মানুষকে তা করতে দেখা যায় না। তুমি এর উপকার করলেও এই লোকটা তোমার অনিষ্ট করবে। তুমি ওকে নিচে ফেলে দাও, আমি খেয়ে চলে যাই, তুমিও বাড়ি যাও।

ভালুক বললে, লোকটি যে চরিত্রেরই হোক, আমার শরণ নিয়েছে, আমি একে নিচে ফেলে দিতে পারবো না। শরণাগতকে বধ করলে মহাপাপ হয়। শাস্ত্রেও বলে, যারা বিশ্বাসঘাতক আর যারা শরণাগতকে হত্যা করে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত তাদের নরকবাস করতে হয়।

তারপর রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হলো। তখন ভালুক তাঁকে বললে, রাজপুত্র! আমি একটু নিদ্রা যাবো। তুমি সাবধানে থাকো।

রাজপুত্র বললেন, তাই হোক।

ভালুক রাজপুত্রের কাছে ঘুমোতে লাগলো।

সেই সময়ে বাঘ রাজপুত্রকে বললে, রাজকুমার! তুমি এই ভালুককে বিশ্বাস করো না। কারণ এ নখী। শাস্ত্রে বলে, নদী, নখী, শৃঙ্গী ও অস্ত্রধারীকে বিশ্বাস করতে নেই; স্ত্রীজাতি ও রাজবংশীয়কেও বিশ্বাস করবে না। এই ভালুককে চপলচিত্ত বোধ হচ্ছে। সুতরাং এর প্রসন্নতাও সাংঘাতিক। শাস্ত্রে বলে, যারা কখন তুষ্ট, কখন রুষ্ট, কখন বা রুষ্ট-তুষ্ট, এই রকম অব্যবস্থিতচেতা ব্যক্তিদের প্রসন্নভাবও ভয়ঙ্কর। এই ভালুক আমার হাত থেকে রক্ষা করে স্বয়ং তোমাকে খাবার ইচ্ছা করছে। অতএব তুমি ওকে নিচে ফেলে দাও। আমি ওকে খেয়ে চলে যাই, তুমিও বাড়ি চলে যাও।

এই কথা শুনে রাজপুত্র ভালুককে যেমন নিচে ফেলে দিলেন, ভালুকও অমনি পড়তে পড়তে গাছে একটি ডাল চেপে ধরলো। তাই দেখে রাজপুত্র আবার ভয় পেলেন।

তখন ভালুক রাজপুত্রকে বললে, রে পাপিষ্ঠ! ভয় পাচ্ছিস্ কেন? আগে যে কাজ করেছিস্ এখন তোকে তার ফল ভোগ করতেই হবে। সুতরাং তুই এখন 'সসেমিরা' এই কথা বলতে বলতে পিশাচ হয়ে ঘুরে বেড়াবি।

এদিকে সকাল হলো, বাঘ সেখান থেকে চলে গেল। ভালুকও রাজপুত্রকে অভিশাপ দিয়ে সেখান থেকে স্বস্থানে চলে গেল।

তখন থেকে রাজকুমার 'সসেমিরা সসেমিরা' বলতে বলতে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। রাজকুমারের ঘোড়াটি তাঁকে দেখতে না পেয়ে রাজধানীতে চলে গিয়েছিল। সওয়ারহীন ঘোড়া দেখে রাজধানীর লোকেরা রাজার কাছে গিয়ে জানালো, কেবল ঘোড়াটি ফিরে এসেছে।

তখন রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, মন্ত্রি! যে সময়ে কুমার মৃগয়ায় যাত্রা করে সে সময়ে বহু রকমের অশুভ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। সে সব গ্রাহ্য না করে কুমার যেমন যাত্রা করেছিল,

এখন তার প্রত্যক্ষ ফল ফলছে। অতএব আমি তার সন্ধানে বনে যাবো।

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ! তাই করা কর্তব্য।

তারপর রাজা ও মন্ত্রী পরিবারবর্গকে নিয়ে যে পথে রাজকুমার মৃগয়ায় যাত্রা করেছিলেন সেই পথে বনে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন, রাজকুমার 'সসেমিরা' 'সসেমিরা' বলতে বলতে পিশাচাকারে ঘুরে

বেড়াচ্ছেন। তাই দেখে রাজা গভীর দুঃখে রাজকুমারকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। অনেক সুবিজ্ঞ বৈদ্যকে ডাকিয়ে আনা হলো। কিন্তু রাজকুমার কারও চিকিৎসাতেই সুস্থ হলেন না।

তখন রাজা বিমর্ষমুখে বললেন, মন্ত্রি! এখন যদি শারদানন্দ বেঁচে থাকতেন তাহলে নিমেষে চিকিৎসা করে রাজকুমারকে সুস্থ করে তুলতেন। আমি তাঁকে হত্যা করেছি। লোকে যে কাজ করে আগে বিবেচনা করে তা করা উচিত। নতুবা মহা বিপদের

সম্ভাবনা। শাস্ত্রেও বলে, যে বিবেচনা করে কাজ করে, গুণমুগ্ধ সম্পদ স্বয়ং এসে তাকে বরণ করে। বিনা পরীক্ষায় কোন কাজ করা উচিত নয়, পরীক্ষা করে কাজে নিযুক্ত হওয়া উচিত! যখন আমি শারদানন্দকে বধ করি তখন কেউই আমাকে বারণ করে নি।

মন্ত্রী বললেন, যা হয়েছে তা সেই কালেরই উপযুক্ত। যেমন ভবিতব্য, বুদ্ধিও তেমন হয়। ভবিতব্যতা না থাকলে যত্ন করলেও তা ঘটে না। কিন্তু ভবিতব্যতা থাকলে বিনা যত্নেও তা ঘটে। যার ভবিতব্যতা নেই, হাতে পেলেও তা বিনষ্ট হয়।

রাজা বললেন, এখন রাজকুমার সম্বন্ধে যত্নবান হওয়া বিশেষ কর্তব্য।

মন্ত্রী বললেন, কি ভাবে?

রাজা বললেন, যে চিকিৎসা করে কুমারকে নীরোগ করতে পারবে তাকে অর্ধেক রাজ্যদান করবো এ কথা সর্বত্র ঘোষণা করে দাও।

রাজার আদেশানুসারে কাজ করে মন্ত্রী নিজ গৃহে ফিরে এলেন এবং মন্ত্রণা করে শারদানন্দকে সব কথা জানালেন।

তাই শুনে শারদানন্দ বললেন, মন্ত্রিবর! আপনি রাজার কাছে গিয়ে এই কথা বলুন যে, 'আমার একটি মেয়ে আছে। যাতে কুমারের সঙ্গে তার দেখা হয় তা করুন। সেই মেয়ে রাজকুমারের আরোগ্যের উপায় করবে।'

মন্ত্রী রাজার কাছে গিয়ে তাই বললেন।

তখন রাজা পাত্রমিত্রসভাসদ্‌গণকে নিয়ে মন্ত্রীর বাড়ি এলেন। সকলেই যথাযথ স্থানে বসলেন। রাজকুমারও 'সসেমিরা' 'সসেমিরা' বলতে বলতে সেখানে এসে আসন গ্রহণ করলেন।

তখন শারদানন্দ আড়ালে থেকে এই শ্লোকটি পাঠ করলেন, 'যে সুহৃৎ সদ্ভাবে এসেছেন তাঁকে প্রতারণা করে কী নিপুণতা দেখানো হয়েছে? ক্রোড়ে শয়ন করে যে নিদ্রা যাচ্ছে, তাকে হত্যা করলে কী পৌরুষ হয়?'

এই কথা শোনামাত্র রাজকুমার 'সসেমিরা' শব্দের প্রথম বর্ণ 'স' বাদ দিয়ে কেবল 'সেমিরা' শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন।

তখন শারদানন্দ আবার এই শ্লোকটি পাঠ করলেন, 'সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও সাগরসঙ্গমে গেলে ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী, কোথাও তার মুক্তি নেই।'

এই শ্লোক শোনামাত্র রাজকুমার 'সসে' বাদ দিয়ে কেবল 'মিরা' বলতে লাগলেন।

তখন শারদানন্দ তৃতীয় শ্লোকটি বললেন, 'যতদিন মহাপ্রলয় উপস্থিত না হয় ততদিন কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক ও মিত্রদ্রোহীকে নরকবাস করতে হয়।'

এই শ্লোক শোনামাত্র রাজকুমার 'সসেমি' বাদ দিয়ে কেবল 'রা' উচ্চারণ করতে লাগলেন।

তখন শারদানন্দ এই চতুর্থ শ্লোকটি বললেন, 'মহারাজ! আপনি যদি কুমারের কল্যাণ কামনা ইচ্ছা করেন, তবে ব্রাহ্মণগণকে দান ও দেবগণকে আরাধনা করুন।'

শ্লোকটি শোনামাত্র রাজকুমার সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর জ্ঞান হলে তিনি পিতার কাছে ভালুকের সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন।

তখন রাজা বললেন, কুমারি! তুমি গ্রামবাসিনী, কখন বনে যাও নি, তবে ভালুকের বৃত্তান্ত জানলে কেমন করে?

যবনিকান্তরালবর্তী শারদানন্দ তখন বললেন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রসাদে আমার জিহ্বায় সরস্বতী বিরাজ করেন। তাঁর প্রসাদেই আমি যেমন ভানুমতীর উরুতে তিলকের কথা জেনেছিলাম, সেই ভাবে এই কথাও জানতে পেরেছি।

এই কথা শুনে রাজার বিস্ময়ের সীমা রইলো না। তিনি পর্দাখানি টেনে সরিয়ে ফেলতেই, শারদানন্দকে দেখতে পেলেন। তখন রাজা ও আর সকলে তাঁকে প্রণাম করলেন। মন্ত্রীও পূর্বের সব কথা প্রকাশ করলেন।

তখন রাজা বহুশ্রুত মন্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন, মন্ত্রি! তোমার সংসর্গে আমি কীর্তিমান হলাম, দুর্গতিও দূর হলো। এখন বুঝলাম, সৎসংসর্গ করা পুরুষের কর্তব্য। সৎসংসর্গ বর্তমান ও ভাবী

তিনি পর্দাখানি টেনে সরিয়ে ফেলতেই শারদানন্দকে দেখতে পেলেন

উভয়বিধ বিপদই দূর করে। জাহ্নবীজল পান করলে পিপাসা দূর হয়, দুর্গতিও বিনষ্ট হয়ে থাকে। তোমার বুদ্ধিকৌশলেই রাজকুমার বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছে। এই রকম মহৎ কুলে যে ব্যক্তির জন্ম তার সংসর্গ করাই রাজার কর্তব্য। শাস্ত্রেও বলে, সর্পমন্ত্র-বিশারদগণ যেমন সর্প সংগ্রহ করে তেমনি কুলীন মন্ত্রী সংগ্রহ করাও রাজার কর্তব্য। সেইরূপ মন্ত্রী গর্বের।

এইভাবে নানারকমের স্তুতিবাদের দ্বারা মন্ত্রীর স্তব করে, তাঁকে বস্ত্র ইত্যাদি দানে সম্মান দেখিয়ে রাজা রাজ্য করতে লাগলেন।

মন্ত্রী ভোজরাজাকে এই উপাখ্যানটি বললেন। তারপর আবার বললেন, মহারাজ! যে রাজা মন্ত্রীর বাক্য শোনেন, তিনি দীর্ঘায়ু ও সুখী হয়ে থাকেন।

ইতি বহুশ্রুতোপাখ্যান।
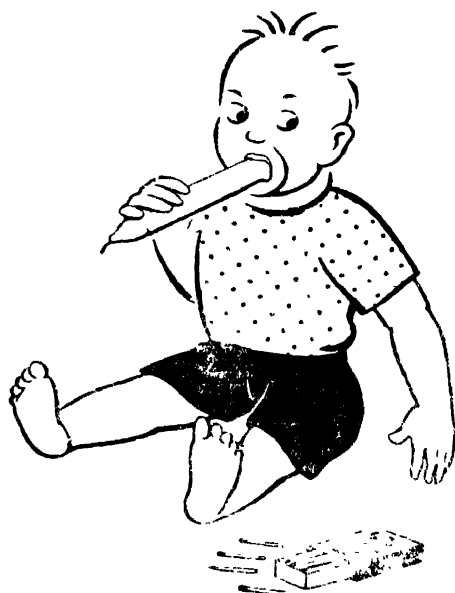
প্রথম পুতুল মিশ্রকেশী

প্রথম উপাখ্যান

তারপর ভোজরাজ সেই সিংহাসন নগরে নিয়ে গেলেন। সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট একটি মণ্ডপ তৈরি করে তার মধ্যে সিংহাসনখানি রাখা হলো।

শুভক্ষণে রাজা মন্ত্রিগণের সঙ্গে সেখানে বিরাজ করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। স্তুতি পাঠকেরা তাঁর প্রশংসা করতে লাগলো। তিনি ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণকে দানমানে সম্মানিত করলেন। দীন, বধির, পঙ্গু, কুব্জ প্রভৃতি সকলকে দান করে ছত্রচামরাদি রাজচিহ্নে চিহ্নিত হয়ে যেমন পুতুলের মাথায় পা রেখে সিংহাসনে উঠে বসতে গেলেন অমনি একটি পুতুল মানুষের মতো কথা বলে উঠলো। সে বললে, রাজন্! যদি বিক্রমাদিত্যের মতো আপনার শৌর্য, উদারতা ও, সত্ত্বাদি গুণ থাকে তাহলে আপনি এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা বললেন, "পুত্তলিকে! তুমি যে সকল গুণের উল্লেখ করলে আমার মধ্যে সে সবই আছে। তোমার বিবেচনায় আমাতে সেই সমস্ত গুণ কম দেখা যায়? আমিও প্রার্থিগণকে সময়োচিত দান করেছি।"

পুতুলটি বললে, "রাজন্! আপনি নিজমুখে আত্মপ্রশংসা করছেন। আপনার পক্ষে তা করা অনুচিত। যে নিজমুখে নিজগুণ কীর্তন করে সে নিশ্চয়ই দুর্জন। সজ্জনেরা কখন এমন করেন না। শাস্ত্রেও বলে, সংসারে দুর্জন ব্যক্তিকেই নিজগুণ ও

পরদোষ কীর্তন করতে দেখা যায়। কিন্তু সজ্জন সত্যই পরদোষ ও নিজগুণ কীর্তন করেন না। আরও আয়ু, ধন, গৃহচ্ছিদ্র, মন্ত্র, ঔষধ, দান, মান, অপমানাদি যত্নসহকারে গোপন রাখবে। অতএব নিজের নিজের গুণ বা অপরের দোষ কীর্তন করবে না।"

রাজা বললেন, "পুত্তলিকে! যে সকল গুণের উল্লেখ করলে আমার মধ্যে সে সবই আছে।"

পুতুলের মুখে এই কথা শুনে ভোজরাজ সবিস্ময়ে তাকে বললেন, "তুমি সত্য বলেছো, যে নিজ গুণ কীর্তন করে সে মূঢ়। আমি নিজগুণ-কীর্তন করেছি, এ অনুচিত। যাহোক, এই সিংহাসন যাঁর তাঁর উদারতার কাহিনী বল।"

পুতুল বললে, "রাজন্! এই সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের। তিনি সন্তুষ্ট হলে প্রার্থিগণকে কোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করতেন। প্রার্থী দেখলেই তিনি তাকে সহস্র, কাছে এসে কথোপকথন করলে অযুত, মহৎ ব্যক্তিকে দেখলে লক্ষ এবং যার উপর সন্তুষ্ট হতেন তাকে কোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করতেন। আপনার সে রকম উদারতা থাকলে এই সিংহাসনে বসুন।"

এই কথা শুনে রাজা মৌন রইলেন।

দ্বিতীয় উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার পুতুলের মাথায় পা রেখে সিংহাসনে উঠবার উদ্‌যোগ করতেই একটি পুতুল তাঁকে মানুষের মতো করে কথা বললে, "রাজন্! রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো যদি আপনার শৌর্য, উদারতা ও সত্ত্বাদি গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ বললেন, "পুত্তলিকে! সেই বিক্রমাদিত্যের উদারতাগুণের কথা বল।"

পুতুলটি বললে "রাজন্! শুনুন। রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন চরগণকে ডাকিয়ে এনে বললেন, 'তোমরা পৃথিবী পরিভ্রণে যাত্রা কর। যেখানে যেখানে কৌতুককর বিষয় বা বিশেষ তীর্থ দেখবে আমার কাছে এসে তৎক্ষণাৎ তার কথা বলবে। তা দেখতে আমি সেখানে যাবো।'

এইভাবে কিছুকাল গেল। এতদিন এক দূত নানা দেশ পরিভ্রমণ করে রাজার কাছে এসে বললে, 'রাজন্! চিত্রকূটপর্বতের কাছে তপোবনমধ্যে একটি সুন্দর দেবালয় আছে। সেখানে পর্বতের উপর থেকে নির্মল জলধারা পড়ছে। সেই জলে স্নান করলে সকল রকমের মহাপাপের ক্ষয় হয়। যে মহাপাপ করে সেই জলে স্নান করে তার দেহ থেকে কালো জল বার হতে থাকে। যে সেখানে স্নান করে সে পুণ্যবান। সেখানে এক ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি প্রশস্ত হোমকুণ্ডে আহুতি দান করছেন। তিনি কত বৎসর

এইভাবে সেখানে আছেন, কেউ জানে না। সেই ব্রাহ্মণ কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। আমি সেই বিচিত্র স্থান দেখেছি।'

রাজা সেই কথা শুনে একাকী দূতের সঙ্গে সেখানে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর আনন্দের সীমা রইলো না। তিনি বললেন, 'স্থানটি অতি পবিত্র। এখানে সাক্ষাৎ জগদম্বা থাকেন। স্থানটি দেখে আমার চিত্ত নির্মল হলো।'

এই বলে সেই ঝরণাধারায় স্নান ও দেবদর্শন করে সেই ব্রাহ্মণ যেখানে হোম করছিলেন সেখানে গিয়ে তাঁকে বললেন, 'হে বিপ্র! আপনি কত বৎসর এখানে হোম করছেন?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'সপ্তর্ষিমণ্ডল যে কালে রেবতীনক্ষত্রের প্রথমপাদে অধিষ্ঠান করছিলেন আমি সেইকালে হোমারম্ভ করি। সপ্তর্ষিমণ্ডল এখন অশ্বিনীনক্ষত্রে অবস্থান করছেন। এই হোমকার্যে আমার শতবর্ষ কেটে গেছে। তবু দেবতা আমার প্রতি প্রসন্ন হলেন না।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনে স্বয়ং দেবতাকে স্মরণ করে সেই হোমকুণ্ডে আহুতি দান করলেন। কিন্তু তাতেও দেবতা প্রসন্ন হলেন না। তখন 'নিজ শিরকমল আহুতি দেব' এই সিদ্ধান্ত করে রাজা বিক্রমাদিত্য যেমন নিজ কণ্ঠে খড়্গাঘাতের উদ্‌যোগ করেলেন, অমনি দেবতা অলক্ষিতে রাজার হস্ত ধারণ করে বললেন. 'রাজন! আমি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।'

রাজা বললেন, 'দেবি! এই ব্রাহ্মণ বহুকাল যাবৎ হোম করছেন, তবে কেন আপনি এঁর প্রতি প্রসন্ন হচ্ছেন না? আর আমার উপরই বা এত শীঘ্র প্রসন্ন হলেন কেন?'

দেবী বললেন, 'রাজন! এই ব্রাহ্মণ হোম করছে সত্য, কিন্তু এর মনে কিছুমাত্র স্বার্থ নেই। কাজেই আমি প্রসন্ন হতে পারিনি। শাস্ত্রে বলে, অঙ্গুলির অগ্রভাগে, মেরুলঙ্ঘন করে ও ব্যস্তচিত্তে যে জপ করা হয়,—এই তিন রকমের জপই বিফল। মন্ত্র, তীর্থ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, দৈব, ঔষধ, গুরু এই সকল বিষয়ে যে যেমন ভাবে তার

সেই রকমেরই সিদ্ধিলাভ হয়। দেখ, কাঠ, পাথর ও মাটির বিগ্রহে দেবতা থাকেন না, তাঁর অধিষ্ঠান ভাবে। ভাবই সিদ্ধির কারণ।'

'রাজন! আমি প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।'

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।'

দেবী বললেন, 'রাজন্! তুমি পরোপকারী বিশাল বৃক্ষের মতো স্বদেহে কষ্ট সহ্য করে পরের কষ্ট লাঘব করছো। শাস্ত্রেও বলে, বিশাল বৃক্ষগুলি নিজেরা রৌদ্রতাপে থেকে পরকে ছায়া দান করে, পরের উপকারেই ফল দান করে থাকে। পরের উপকারের জন্যই নদী বয়ে যায়, পরের উপকার করতেই গাভীগণ দুগ্ধ দেয়। বস্তুতঃ পরোপকার করতেই এই দেহ ধারণ।'

দেবী এইভাবে রাজার প্রশংসা করে ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। রাজাও নিজ রাজধানীতে চলে গেলেন।"

এই কথা বলে পুতুলটি রাজাকে বললে, "আপনার যদি এই রকম ধৈর্য থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা মৌন রইলেন।
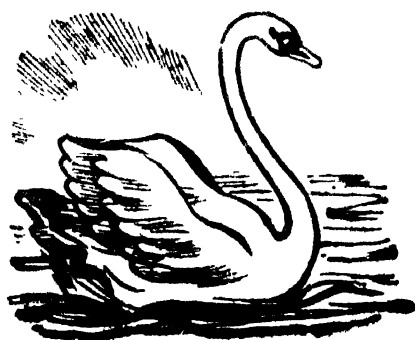
তৃতীয় পুতুল সুপ্রভা

তৃতীয় উপাখ্যান

রাজা আবার সিংহাসনে বসবার উপক্রম করতেই তৃতীয় পুতুল বললে, "যাঁর বিক্রমাদিত্যের মতো উদারতাগুণ আছে তিনিই এই সিংহাসনে বসবার যোগ্য।"

রাজা বললেন, "তুমি সেই রাজার উদারতা গুণকীর্তন কর।"

পুতুল বললে, "রাজন্! শুনুন। 'এই মানুষটি পর, এই মানুষটি আপন' যাঁর মনে এই রকমের দ্বিধাভাব না থাকে তিনি সমগ্র বিশ্ব পালন করতে সক্ষম। শাস্ত্রে বলে, 'এই মানুষটি পর, এই মানুষটি আমার' লঘুচেতা ব্যক্তিই এইরূপ বিবেচনা করে। যাঁরা উদারচরিত্র সমগ্র বসুধা তাঁদের কুটুম্ব স্বরূপ—তাঁরা সকল মানুষকে আমার বিবেচনা করেন। সাহসে উদ্যমে ধৈর্যে বিক্রমাদিত্যের সমান কেউ ছিলেন না। সেজন্য দেবতাগণ তাঁকে সাহায্য করতেন।

শাস্ত্রে বলে, 'উদ্যম, সাহস, ধৈর্য, শক্তি, বুদ্ধি ও পরাক্রম—এই ছয়টি গুণ যাঁর মধ্যে থাকে, দেবতাও তাঁকে ভয় করেন।'

রাজন্! যিনি প্রার্থিগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তাঁর অভীষ্ট দেবতা সিদ্ধ করেন। শাস্ত্রেও বলে, 'যদি দৃঢ়তা থাকে তা হলে বিষ্ণুও সত্য সত্যই মানুষের কার্য সম্পাদন করে দেন। যে ব্যক্তি উৎসাহী, দীর্ঘসূত্রতাহীন, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া জানেন, বিপদে নির্বিকার, শূর, কৃতী ও দৃঢ়সংকল্প, লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁর কাছে থাকতে ইচ্ছা করেন।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এই রকমের কৃতজ্ঞ, সর্বগুণাধার ও সকল সম্পদে পূর্ণ ছিলেন। একদিন তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, 'অহো! এই সংসার অসার। কবে কার কী ঘটে, কেউই জানতে পারে না। কাজেই উপার্জিত অর্থ যদি দান বা ভোগ করা না যায় তাহলে তা সফল হয় না। সুতরাং সৎপাত্রে দানই অর্থার্জনের একমাত্র ফল। এর অন্যথা হলে বিনাশপ্রাপ্ত হতে হয়।

শাস্ত্রেও বলে, 'অর্থের গতি তিন রকম—দান, ভোগ ও নাশ। সম্পত্তি থাকতেও যে দান ও ভোগ না করে সে বিভব তার নয়। বেগবান বাতাসে কম্পিত দীপশিখার মতো কমলাও চঞ্চলা। সরোবরগর্ভে যে জল সঞ্চিত থাকে পরকে দানই তার উদ্দেশ্য। অতএব উপার্জিত অর্থও তেমনি পরকে দানের জন্যই সঞ্চিত হয়।'

মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করে রাজা বিক্রমাদিত্য সর্বস্ব দক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে উদ্যোগী হলেন। তারপর শিল্পিগণ মনোহর মণ্ডপ নির্মাণ করলেন। সকল রকমের যজ্ঞদ্রব্য সংগৃহীত হলো। দেবতা, মুনি, গন্ধর্ব, যক্ষ, সিদ্ধ প্রভৃতি সকলে আমন্ত্রিত হলেন।

ইত্যবসরে সমুদ্রকে আহ্বান করতে এক ব্রাহ্মণকে সমুদ্রতীরে পাঠান হলো। সেই ব্রাহ্মণও সমুদ্রতীরে গিয়ে গন্ধপুষ্পাদি ষোড়শোপচারে সমুদ্রের পূজা করে বললেন, 'হে সমুদ্র! রাজা বিক্রমাদিত্য যজ্ঞ করছেন। আমি তদ্দ্বারা প্রেরিত হয়ে তোমাকে আহ্বান করতে উপস্থিত হয়েছি।' এই বলে জলমধ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল অপেক্ষা করলেন।

সে কথার কেউই প্রত্যুত্তর দিলে না। তখন ব্রাহ্মণ যেমনি উজ্জয়িনীতে ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছেন অমনি সমুদ্র দেদীপ্যমান শরীরে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ! বিক্রমাদিত্য আমাকে আহ্বান করতে তোমাকে পাঠিয়েছেন। তদ্দ্বারা তিনি আমাদের যে সম্মান করেছেন তা আমাদের যোগ্য। যথাসময়ে দানমানাদি করা সুহৃদের লক্ষণ।

শাস্ত্রেও বলে, দান, প্রতিগ্রহ, গোপনকথা প্রকাশ, প্রশ্ন, ভোজন, আহার্য দান এই ছয়টি প্রীতির লক্ষণ। দূরে থাকলেই যে প্রীতি নষ্ট হয় আর কাছে থাকলেই যে প্রীতি বৃদ্ধি পায় একথা সত্য নয়। স্নেহই এর প্রমাণ। যে ব্যক্তি অন্তরে বিরাজ করে সে দূরে থাকলেও নিকটের এবং যে অন্তরে বিরাজ করে না সে নিকটে থাকলেও দূরের মনে হয়। দেখ, গিরিশিখরে ময়ূর ও গগনে মেঘ,

'এই রত্নগুলো নিয়ে গিয়ে রাজার হাতে দান কর।'

লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে সূর্য ও সলিলে পদ্ম, দুই লক্ষ যোজন দূরে কুমুদনাথ চন্দ্র বাস করে। যে যার হৃদয়ের সে তার কাছে, দূরের নয়। এ কারণ আমার সেখানে যাওয়া কর্তব্য। কিন্তু এখানে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। সেই রাজাকে ব্যয় নির্বাহের

জন্য চারটি রত্ন দান করবো। এই চারটি রত্নের মাহাত্ম্য এই যে, যে বস্তু স্মরণ করা যায় প্রথম রত্নটি তাই দান করে! দ্বিতীয় রত্নটির দ্বারা অমৃততুল্য ভোজ্যাদি উৎপন্ন হয়; তৃতীয় রত্নটি থেকে অশ্ব-রথ-পদাতিসমন্বিত চতুরঙ্গ বল আবির্ভূত হয়। আর চতুর্থ রত্নটি থেকে সুন্দর অলঙ্কারাদি জন্মে। তুমি এই রত্নগুলো নিয়ে গিয়ে রাজার হাতে দান কর।'

তারপর ব্রাহ্মণ রত্ন কয়টি নিয়ে যখন উজ্জয়িনীতে এলেন তখন যজ্ঞ সমাপ্ত হয়েছে। বিক্রমাদিত্য স্নানান্তে প্রার্থিগণের অভিলাষ পূর্ণ করছেন। ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রত্ন কয়টি রাজার হাতে দান করে তাদের গুণ কীর্তন করলেন।

তখন রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ! তুমি যজ্ঞের দক্ষিণা-দানের সময় অতিক্রম করে উপস্থিত হয়েছ। আমি সবই ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করেছি। তুমি এই চারটি রত্নের মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ কর।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমি বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রী, পুত্র, আর পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করে যেটি সকলের ইচ্ছা হয় সেটি গ্রহণ করবো।'

রাজা বললেন, 'তাই করো।'

তখন ব্রাহ্মণ বাড়ি এসে তাদের সকলের কাছে সকল বৃত্তান্ত বললেন।

ব্রাহ্মণের মুখে সকল কথা শুনে তাঁর পুত্র বললে, 'যে রত্ন চতুরঙ্গ বল দান করে তাই গ্রহণ করবো। তাতে সুখে রাজত্ব করা যাবে।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'বুদ্ধিমান রাজ্য প্রার্থনা করেন না। দেখ—রামের বনগমন, বলির পাতালে বাস, পাণ্ডুপুত্রগণের বনে অবস্থান, বৃষ্ণিগণের নিধন, নল রাজার রাজ্যনাশ, সৌদাসেরও সেই অবস্থা, অর্জুন নিধন ও লোকপালবর্গের রাজ্যের জন্য বিড়ম্বনা ভোগ এই সকল ঘটনা দেখে রাজ্য কামনা করা উচিত নয়।'

এই বলে পিতা আবার বললেন, 'যে রত্নটি থেকে ধন উৎপন্ন হয়, তাই গ্রহণ কর। ধন দিয়ে সবই পাওয়া যায়। এমন জিনিস সংসারে নেই, যা ধন দিয়ে পাওয়া যায় না। এই সকল বিবেচনা করে বুদ্ধিমানেরা ধন উপার্জন করে।'

ব্রাহ্মণের স্ত্রী বললেন, 'যে রত্নটি থেকে ছয় রকমের রসযুক্ত ভোজ্য উৎপন্ন হয় সেই রত্নটি গ্রহণ কর। অন্নেই সকল জীব প্রাণধারণ করে। শাস্ত্রেও বলে, মর্ত্যবাসিগণের জন্যই বিধাতা অন্ন সৃষ্টি করেছেন। অতএব অন্ন ছাড়া আর কিছুই প্রার্থনীয় নয়।'

পুত্রবধূ বললেন, 'যে রত্ন থেকে বস্ত্র ও রত্নালঙ্কার উৎপন্ন হয় তাই গ্রহণ করা উচিত। সকলেই জানে, সুন্দর অলঙ্কার মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। অলঙ্কার দ্বারা শুচি হওয়া যায়, অলঙ্কারই সৌভাগ্য, আয়ু ও লক্ষ্মী বৃদ্ধি করে।'

এইভাবে চারজন বিবাদ করতে লাগলেন। তারপর ব্রাহ্মণ রাজার কাছে গিয়ে চারজনের এই বিবাদের কথা জানালেন। তখন রাজা ব্রাহ্মণকে চারটি রত্নই দান করলেন।"

এই উপাখ্যান শেষ করে পুতুল রাজাকে বললে, "রাজন্। উদারতা মানুষের সহজাত গুণ। যেমন চম্পকে গন্ধ, মুক্তায় কান্তি, ইক্ষুতে মাধুর্য থাকে তেমনি উদারতাও সহজাত। আপনাতে যদি এই রকম উদারতা থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

পুতুলের কথা শুনে রাজা মৌন রইলেন।

চতুর্থ পুতুল ইন্দ্রসেনা

চতুর্থ উপাখ্যান

আবার একটি পুতুল বললে, “রাজন্, শুনুন! বিক্রমাদিত্য রাজ্য করছেন, সেই সময়ে তাঁর রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি সকল বিদ্যায় পারদর্শী ও সকল গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্র ছিল না। একদিন তাঁর ভার্যা তাঁকে বললেন, ‘প্রাণেশ্বর! স্মৃতিবিদ্‌গণ বলেন, পুত্র বিনা গৃহস্থের গতি নেই। শাস্ত্রেও বলে, অপুত্রকের গতি নেই, তার স্বর্গপ্রাপ্তিরও আশা নেই। সুতরাং পুত্র জন্মগ্রহণ করলে পুত্রের মুখ দেখে তাপসব্রত অবলম্বন করবে। চন্দ্র যেমন রাত্রির আলো, সূর্য যেমন প্রভাতের আলো এবং ধর্ম যেমন ত্রিভুবনের আলো, সৎপুত্রও তেমনি বংশের আলোক। হস্তী যেমন মদদ্বারা, জল যেমন পদ্মদ্বারা, রাত্রি যেমন পূর্ণচন্দ্র দ্বারা, নারী যেমন সলজ্জ চরিত্র দ্বারা, অশ্ব যেমন বেগদ্বারা, মন্দির যেমন নিত্যোৎসব দ্বারা, বাক্য যেমন ব্যাকরণ-দ্বারা, নদী যেমন হংসমিথুনদ্বারা, সভা যেমন পণ্ডিতগণদ্বারা এবং ত্রিভুবন যেমন সূর্যদ্বারা শোভিত হয় বংশও তেমনি সৎপুত্রদ্বারা শোভা পায়।’

ব্রাহ্মণ বললেন, ‘প্রিয়ে! তুমি সত্যই বলেছো। আবার পরের উদ্যমদ্বারাও দ্রব্যলাভ হতে পারে। গুরুর সেবায় বিদ্যা লাভ হয়। কিন্তু ভগবানের উপাসনা ব্যতীত কীর্তি ও সন্তানলাভ

হয় না। শাস্ত্রেও বলে, অন্তরে যদি নিয়ত সুখলাভের কামনা থাকে, তাহলে অচলা ভক্তি নিয়ে ভবানীপতির ভজনা করবে।'

ব্রাহ্মণী বললেন, 'আপনি সর্বজ্ঞ। অতএব পরমেশ্বরের প্রসাদের জন্য একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করুন।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'তোমার কথাতেই আমি অঙ্গীকার করলাম। কারণ বালকের কাছ থেকেও যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় বাক্য গ্রহণ করা বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্তব্য এবং যে বাক্য ক্ষতিকর ও যুক্তিযুক্ত নয়, বৃদ্ধের কাছ থেকেও সেরকম বাক্য গ্রহণ করবে না।'

এই বলে ব্রাহ্মণ পরমেশ্বরের প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে রুদ্রানুষ্ঠান আরম্ভ করলেন।

তারপর ব্রাহ্মণ একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, জটামুকুটধারী পরমেশ্বর বৃষভে আরোহণ করে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বলছেন, 'হে ব্রাহ্মণ! তুমি প্রদোষব্রতের অনুষ্ঠান কর। তাহলেই তোমার পুত্রলাভ হবে।'

পরদিন প্রভাতে ব্রাহ্মণ বৃদ্ধগণের কাছে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন। তাঁরা বললেন, 'এ স্বপ্ন সত্য! কারণ, স্বপ্নাধ্যায়ে বলে, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গো, গুরু, পিতৃগণ, সন্ন্যাসী ও রাজা যা বলেন তা সত্য হয়। অতএব ঐ ব্রত সম্পাদন করলে তোমার পুত্র জন্মলাভ করবে।'

বৃদ্ধগণের কথা শুনে ব্রাহ্মণ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে শনিবারে কল্পোক্ত বিধি অনুসারে প্রদোষব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। পরমেশ্বরও প্রসন্ন হয়ে তাঁকে পুত্রদান করলেন।

ব্রাহ্মণ পুত্রের জাতকর্মাদি সমাপন করে দ্বাদশ দিনে তার নাম রাখলেন, 'দেবদত্ত'। যথাসময়ে পুত্রটির অন্নপ্রাশন ও উপনয়নাদিও সম্পন্ন হলো। পরে সেই পুত্রকে বেদশাস্ত্রাদিতে শিক্ষিত করে ব্রাহ্মণ তার ষোড়শ বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়ে নিজে তীর্থযাত্রার ইচ্ছা করে তাকে এই সকল উপদেশ দান করলেন—

'বৎস! অত্যন্ত দুঃখে পড়লেও স্বধর্ম ত্যাগ করো না, কারো

সঙ্গে কলহ করো না, সকলকে দয়া করবে, নিয়ত পরমেশ্বরে ভক্তি রাখবে, পরস্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দিও না, বলবানের সঙ্গে বিরোধ করো না, যে ব্যক্তি তত্ত্ব জানে তার অনুসরণ করবে, কোন প্রসঙ্গ উঠলে সেই মতো কথা বলবে, নিজ বিত্তানুসারে ব্যয় করবে, সজ্জনগণের সেবা করবে, দুর্জনদের পরিত্যাগ করবে, আর, স্ত্রীলোকদের কাছে কখনও গোপনীয় কথা বলবে না।'

ব্রাহ্মণ পুত্রকে এই ধরনের নানা উপদেশ দান করে বারাণসীধামে চলে গেলেন। দেবদত্ত পিতার উপদেশ পালন করে সেই নগরেই রইলেন।

একদিন দেবদত্ত হোমের জন্য সমিধ কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গভীর বনে প্রবেশ করলেন। যখন তিনি সমিধ কাটছেন সেই সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য মৃগয়ার উদ্দেশ্যে সেই বনে প্রবেশ করে একটি শূকরের পিছনে ছুটতে ছুটতে গভীর বনে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেই বন থেকে বার হবার পথ ঠিক করতে না পেরে দেবদত্তকে দেখতে পেয়ে তাঁকে নগরে যাবার পথ জিজ্ঞাসা করলেন। দেবদত্ত রাজার প্রশ্ন শুনে তাঁর আগে আগে চলে তাঁকে নিয়ে নগরে এলেন। তারপর রাজা দেবদত্তকে বহু সম্মান দান করে তাঁকে কোন কাজে নিযুক্ত করলেন।

তারপর বহুদিন গেল। একদিন রাজা বললেন, 'কি উপায়ে আমি দেবদত্তর উপকার থেকে মুক্ত হবো? তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বন থেকে রাজধানীতে পৌঁছে দিয়েছেন, কি করলে তাঁর উপকার-ঋণ পরিশোধ হয়? তিনি আমাকে মহারণ্য থেকে গ্রামে এনেছেন।'

সেই সময়ে একটি লোক বললে, 'সৎপুরুষ কৃতোপকার কখন ভোলেন না। লোকে বলে, প্রথম জীবনে সামান্য জল পান করেছে এটি স্মরণ করে নারিকেল বৃক্ষসকল মাথায় বহু ফল বহন করে আজীবন প্রচুর অমৃততুল্য জল দান করে। সুতরাং সাধুগণ কৃতোপকার কখন ভোলেন না।'

রাজার পূর্বকথা শুনে দেবদত্ত মনে মনে চিন্তা করলেন, 'রাজা যা বললেন, সত্য কী মিথ্যা তা পরীক্ষা করতে হবে।'

এই রকম স্থির করে অন্যের অজ্ঞাতসারে রাজকুমারকে নিজগৃহে লুকিয়ে রাখলেন এবং তাঁর দেহের সমস্ত অলঙ্কার নিজ ভৃত্যের হাত দিয়ে নগরে বিক্রয় করতে পাঠালেন।

'পাপিষ্ঠ! তোর হাতে এই অলঙ্কারগুলো কী করে এল?'

এদিকে রাজবাড়িতে মহাকোলাহল উপস্থিত হলো। চারদিকে এই কথা ছড়িয়ে পড়লো—'কেউ হয়তো রাজকুমারকে হত্যা করে থাকবে।'

রাজাও নিজপুত্রের অন্বেষণের জন্য রাজপুরুষদের চারধারে পাঠালেন। রাজপুরুষেরা যখন দোকানের মধ্যে রাজকুমারকে অন্বেষণ করছেন সেই সময়ে দেবদত্তের ভৃত্যের হাতে অলঙ্কারগুলো

দেখতে পেলেন। অলঙ্কারগুলো রাজকুমারের বলে চিনতে পেরে তাঁরা তাকে বেঁধে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। রাজভৃত্যেরা ভৃত্যটিকে বললে, 'পাপিষ্ঠ! তোর হাতে এই অলঙ্কারগুলো কী করে এল?'

ভৃত্যটি বললে, 'আমি দেবদত্তের ভৃত্য। তিনি এই অলঙ্কারগুলো আমার হাতে দিয়েছেন। আমাকে বলেছেন, অলঙ্কারগুলো দোকানে বেচে এস।'

তখন রাজা দেবদত্তকে ডাকিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেবদত্ত! এই অলঙ্কার তোমার হাতে কে দিয়েছে?'

দেবদত্ত বললেন, 'কেউই দেয়নি। আমিই ধনলোভে রাজকুমারকে হত্যা করে তাঁর সমস্ত অলঙ্কারের মধ্য থেকে এইগুলো নিয়ে ভৃত্যের হাতে দিয়ে বিক্রয় করতে পাঠিয়েছিলাম। এখন আপনার যা অভিরুচি করুন। কর্মফলবশে আমার এমন বুদ্ধির উদয় হয়েছিল।'

এই বলে তিনি অধোবদনে রইলেন। রাজাও তাঁর কথা শুনে মৌন রইলেন।

তখন সভামধ্যে নানা লোকে নানা রকমের মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো

সভ্যগণ বললেন, 'রাজন্! লোকটি শিশু হত্যা করেছে। বিশেষ করে স্বর্ণচোর। অতএব একে শতখণ্ডে কেটে এর মাংস শকুনদের দেওয়া হোক।'

তাঁদের কথা শুনে রাজা বললেন, 'হে সভ্যগণ! এই ব্যক্তি আমার আশ্রিত, বিশেষতঃ পূর্বে আমাকে পথ দেখিয়ে উপকার করেছে। অতএব আশ্রিতের দোষগুণ চিন্তা সৎপুরুষের কর্তব্য নয়। শাস্ত্রে বলে, চন্দ্র ক্ষয়রোগী, বিকলাঙ্গ ও জড়াত্মার বিপত্তির সময়ে দোষের কারণ হলেও পরমেশ্বর তাকে নিজশিরে ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং সৎপুরুষেরা আশ্রিতের দোষগুণ বিচার করেন না। যে ব্যক্তি উপকারীর প্রতি সাধু ব্যবহার করে, তার সাধুত্বের কী গুণ?

কিন্তু যে ব্যক্তি অপকারীর প্রতি সাধু ব্যবহার করে সজ্জনেরা তাকে সাধু বলেন।'

এই কথা বলে রাজা দেবদত্তকে বললেন, 'দেবদত্ত। তুমি অন্তরে ভয় পেও না। পূর্বের কর্মফলেই আমার পুত্র নিহত হয়েছে। তোমার অপরাধ কী? কৃতকর্মের ফল কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না। যাঁর জননী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, বিষ্ণু যাঁর পিতা, যিনি স্বয়ং বিষমায়ুধ, তথাপি সেই কামদেব মহেশ্বর কর্তৃক ভস্মীভূত হয়েছিলেন। সুতরাং কর্মফল যে লঙ্ঘন করতে পারে? দেবদত্ত, আমাকে গহন বন থেকে পথ দেখিয়ে নগরে এনে আমার পরম উপকার করেছো। সহস্র প্রত্যুপকার করলেও সে উপকার-ঋণ থেকে উত্তীর্ণ হতে পারবো না।'

এইভাবে রাজা বিক্রমাদিত্য দেবদত্তকে আশ্বাস দান ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত করে বিদায় দিলেন। তখন দেবদত্তও রাজকুমারকে এনে রাজার হাতে দান করলেন।

তাই দেখে রাজা সবিস্ময়ে বললেন, 'এ কী!'

দেবদত্ত বললেন, 'আপনি পূর্বে বলেছিলেন—এর উপকার থেকে উত্তীর্ণ হতে পারলাম না। তাই আপনাকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এই কাজ করেছিলাম। এখন আপনার কথায় বিশ্বাস জন্মালো।'

রাজা বললেন, 'যে উপকার বিস্মৃত হয়, সে নরাধম।'

দেবদত্ত বললেন, 'রাজন্। অপনি জগতের অহেতুক উপকারী। সুতরাং সংসারে আপনি সুজন বলে গণ্য। শাস্ত্রেও বলে, যাঁরা পরের হিতকামনায় জীবন ধারণ করেন, তাঁরাই সুজন, ধনবান্, কৃতী ও সুখী।"

পুতুল এই উপাখ্যানটি বর্ণনা করে রাজাকে বললে, "রাজন্! যদি আপনাতে এই রকম পরোপকার ও উদারতাগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ মৌন রইলেন।

পঞ্চম পুতুল সুদতী

পঞ্চম উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসবার উদ্‌যোগ করতেই আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্‌! শুনুন! বিক্রমাদিত্য রাজ্য পালন করছেন, এমন সময়ে একদিন এক রত্নবণিক এসে তাঁর হাতে একটি মহামূল্য রত্ন দান করলেন।

রাজা সেই উজ্জ্বল রত্নটি দেখে সেটি পরীক্ষার জন্য পরীক্ষকদের ডাকিয়ে এনে বললেন, 'এই রত্নটি কেমন, সমীচীন কী অসমীচীন, এর মূল্যই বা কত, তা স্থির কর।'

পরীক্ষকেরা রত্নটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে রাজাকে বললেন, রাজন্‌। এ রত্ন অমূল্য। যদি এর প্রকৃত মূল্য না জেনে ক্রয় করা যায়, তাহলে আমাদের মহা অনিষ্ট হবে।'

রাজা এই কথা শুনে তাঁদের প্রচুর সামগ্রী দান করে রত্নবণিককে বললেন, 'তোমার কাছে এই রকম রত্ন আর আছে কী?'

রত্নবণিক বললেন, 'রাজন্‌! এ রকম রত্ন আমি আর সঙ্গে আনিনি বটে, আমার বাড়িতে এরকম রত্ন আরও দশটি আছে। যদি দরকার হয়, মূল্য স্থির করে তাও গ্রহণ করতে পারেন।'

তখন রত্ন-পরীক্ষকেরা এক একটি রত্নের মূল্য ছয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা স্থির করলেন। রাজা সেই অনুসারে দশটি রত্নের জন্য সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা বণিককে দান করে তাঁর সঙ্গে একজন বিশ্বাসী মণিকার-ভৃত্যকে

পাঠালেন। রাজা মণিকারকে বলে দিলেন, 'যদি আট দিনের মধ্যে তুমি সমস্ত রত্ন নিয়ে ফিরে আসতে পার তাহলে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেবো।'

মণিকার বললেন, 'দেব! আমি আট দিনের মধ্যেই ফিরে আসবো। যদি না আসতে পারি, দণ্ড ভোগ করবো।'

এই বলে মণিকার সেই রত্নবণিকের সঙ্গে তাঁর গৃহে গমন করলেন।

সেখানে পৌঁছলে বণিক মণিকারের হাতে দশটি রত্ন দান করলেন।

মণিকার সেগুলো নিয়ে যখন আসেন তখন ঘোর বৃষ্টি আরম্ভ হলো। বৃষ্টিতে নদী দুকূল ছাপিয়ে বইতে লাগলো। ফলে নদী পার হতে না পেরে মণিকার তীরের এক মাঝিকে বললেন, 'মাঝি! আমাকে নদী পার করে দাও।'

মাঝি বললে, 'এখন নদীর জল তীর ছাপিয়ে উঠেছে। কেমন করে পার করে দেবো? এমন প্রবল স্রোতোভরা নদী পার হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শাস্ত্রেও বলে, মহানদী পার, মহাপুরুষের সঙ্গে বিগ্রহ, মহাজনের সঙ্গে বিরোধ—এ সব দূর থেকে ত্যাগ করবে। আরও কথিত আছে—পূর্ণ নদীকে, নৃপতির আদর ও বণিকের স্নেহে কখন বিশ্বাস করবে না। নদী, নখী, শৃঙ্গী, অস্ত্রধারী, নারী ও রাজকুলকে বিশ্বাস করতে নেই।'

মণিকার বললেন, 'মাঝি! তুমি যা বললে তা সত্য। তবু আমার খুব বড় কাজ আছে। সামান্য কাজের চেয়ে বিশেষ কাজ বলবান্। বিশেষ কাজে সামান্য কাজ গণ্যই নয়। সর্বত্র এটি দেখা যায়। সুতরাং নদী পার হওয়া আমার পক্ষে সামান্য কাজ। রাজকাজ বলবান্।'

মাঝি বললে, 'এমন বড় কাজ কী?'

মণিকার বললেন, 'যদি এই দশটি রত্ন নিয়ে আজই রাজার কাছে উপস্থিত না হই তাহলে রাজা আমায় শাস্তি দেবেন।'

মাঝি বললে, 'দশটি রত্নের মধ্যে যদি আমাকে পাঁচটি দাও তা হলে তোমায় নদী পার করে দি।'

তখন মণিকার মাঝিকে পাঁচটি রত্ন দিয়ে নদী পার হলেন এবং রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে পাঁচটি রত্ন দিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এই পাঁচটি রত্ন এনেছ কেন? বাকি পাঁচটি রত্ন কি করলে?'

মাঝি বললে, 'দশটি রত্নের মধ্যে যদি আমাকে পাঁচটি দাও তাহলে তোমায় নদী পার করে দি!'

মণিকার বললেন, 'দেব। আমার নিবেদন শুনুন। এই নগর থেকে বার হয়ে আমি সেই রত্নবণিকের নগরে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে

রত্ন দশটি নিয়ে যখন ফিরে আসি তখন পথে ঘোর বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বৃষ্টির জলে নদীর দু'কূল ছাপিয়ে যাওয়ায় প্রবল স্রোত বইতে থাকে। আট দিনের মধ্যে প্রভুর চরণ দর্শন করার কথা ছিল। কিন্তু নদী ছিল দুস্তরা। এই সব বিবেচনা করে নদী পার হবার জন্য মাঝিকে পাঁচটি রত্ন দি। অবশিষ্ট পাঁচটি রত্ন নিয়ে প্রভুর কাছে উপস্থিত হয়েছি। যদি আট দিনের মধ্যে না আসতাম, আদেশ লঙ্ঘনের ফলে প্রভুর মনে কষ্ট হতো। এই সমস্ত চিন্তা করেই মাঝিকে পাঁচটি রত্ন দিয়েছি।'

রাজা মণিকারের মুখে এই কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বাকি পাঁচটি রত্ন তাঁকেই দান করলেন।"

পুতুল এই বৃত্তান্ত শেষ করে ভোজরাজকে আবার বললে, "রাজা বিক্রমাদিত্য এই রকম উদারতা-গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আপনাতে যদি সেরূপ উদারতা থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।'

শুনে ভোজরাজ মৌন রইলেন।

———

ষষ্ঠ পুতুল
অনঙ্গ-নয়না

ষষ্ঠ উপাখ্যান

আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্! শুনুন। বিক্রমাদিত্য রাজ্য করছেন এমন সময়ে একদিন চৈত্র মাসে বসন্তোৎসবের সময়ে তিনি সমস্ত অন্তঃ-পুরিকাগণকে নিয়ে ক্রীড়া-কাননে গেলেন। কাননটি নানা রকমের তরুদলে সুশোভিত। তার প্রাঙ্গণ চন্দ্রকান্তপাথরে তৈরি, ভিত্তি ইন্দ্র-নীলমণি-খচিত সুন্দর। রাজা পদ্মিনী প্রভৃতি চার রকমের সুন্দরী রমণী সঙ্গে এনেছিলেন। তাঁরা সকলেই বস্ত্র, তাম্বুল ও পুষ্পালঙ্কারে সজ্জিত। রাজা তাঁদের সঙ্গে বহুদিন সেই কাননে রইলেন।

সেই কাননের কাছে চণ্ডিকাদেবীর একটি মন্দির ছিল। সেখানে একজন ব্রহ্মচারী বাস করতেন। তিনি রাজাকে সেখানে দেখে মনে মনে চিন্তা করলেন, 'আহা! আমি তপস্যায় বৃথা সময় কাটালাম। স্বপ্নেও বিষয়-ভোগজনিত সুখ কি তা অনুভব করলাম না। শাস্ত্রে বলে, বিষয়-ভোগ থেকে যে সুখ তা দুঃখের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু এ মূর্খের ধারণা। কোন ব্যক্তি কি শুভ্রবর্ণ তণ্ডুল ত্যাগ করে তুষমিশ্রিত খুদ আহারের ইচ্ছা করে? এই অসার সংসারে হরিণনয়না নারী নিঃসন্দেহে পূজনীয়া। তার জন্যই ধনকামনা করবে। স্ত্রী না থাকলে ধনে কী কাজ? এই অসার সংসারে পত্নীই সার। এই চিন্তা করেই শিব পার্বতীকে অর্ধাঙ্গে ধারণ করেছেন। রাজা বিক্রমাদিত্য প্রসঙ্গক্রমে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

অতএব তাঁর কাছে পুরস্কার প্রার্থনা করে একটি কাঞ্চনবর্ণ কন্যাকে বিবাহ করে সংসার-সুখ ভোগ করবো।'

এইরূপ স্থির করে সন্ন্যাসী রাজার কাছে এসে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, 'পার্বতীর কটাক্ষ আপনাকে রক্ষা করুক।'

'একটি কাঞ্চনবর্ণ কন্যাকে বিবাহ করে সংসার-সুখ ভোগ করবো।'

রাজা তাঁকে আসনে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ব্রাহ্মণ! আপনি কোথা থেকে এখানে এলেন?'

ব্রহ্মচারী বললেন, 'এইখানেই জগদম্বা চণ্ডিকার পরিচর্যায় নিযুক্ত আছি। দেবীর নিত্য সেবায় আমার পঞ্চাশ বৎসর কেটেছে। এতকাল আমি ব্রহ্মচারী। আজ নিশাশেষে দেবী আমার সম্মুখে স্বপ্নে আবির্ভূতা হয়ে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ! এতকাল আমার সেবা

করে তুমি শ্রান্ত হয়েছ। তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি এখন গৃহস্থাশ্রম স্বীকার কর, পুত্র উৎপাদন কর, শেষে মোক্ষে মনোনিবেশ করবে। নচেৎ তোমার মুক্তি নেই। যে ব্যক্তি তিন আশ্রমের কর্তব্য শেষ না করে মুক্তিতে মনোনিবেশ করে তার মোক্ষ লাভ হয় না, উপরন্তু সে অধঃপতিত হয়। প্রথমে ব্রহ্মচর্য, তার পরে গার্হস্থ্য, তারপর বানপ্রস্থ ধর্ম পালন করে শেষে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করবে। তুমি যদি রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা কর, তাহলে তিনি তোমার মনোরথ পূর্ণ করবেন।' দেবী স্বপ্নে আমাকে এই কথা বলেছেন। সেই কারণেই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

ব্রহ্মচারী রাজাকে এই রকম কপট বাক্য বললেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনে মনে মনে চিন্তা করলেন, এই লোকটি নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলছে। তা হোক, তবু লোকটি প্রার্থী। এর মনোরথ পূর্ণ করা কর্তব্য। শাস্ত্রেও বলে, আর্তকে দান, শূন্য লিঙ্গের পূজা ও আশ্রিতকে নিত্য পালন করলে রাজার পক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়।'

রাজা মনে মনে এই বিচার করে একটি নতুন নগর তৈরি করিয়ে ব্রহ্মচারীকে সেখানকার অধিপতির পদে অভিষেক করে তাঁকে একশত বিলাসিনী নারী, পঞ্চাশটি হাতী, পাঁচশ' ঘোড়া ও চার হাজার সৈন্য দান করলেন। সেই নগরের নাম হলো 'চণ্ডিকাপুর'।

ব্রাহ্মণের মনোরথ পূর্ণ হলো। তিনি রাজাকে আশীর্বাদ করে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর রাজা স্বনগরে চলে গেলেন।"

পুতুল এই উপাখ্যান বর্ণনা করে রাজাকে বললে, "রাজন্! যদি আপনাতে এই রকম উদারতা থাকে, তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ মৌন রইলেন।

সপ্তম পুতুল
কুরঙ্গ-নয়না

সপ্তম উপাখ্যান

আর একটি পুতুল আবার বিক্রমাদিত্যের চরিত-কথা বলতে আরম্ভ করলো।

পুতুলটি বললে, "রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে সকলেই সুখে বাস করতো। তখন দুর্জন-কণ্টক ছিল না, সকলেই সদাচারী ছিল। ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়নে ও স্বকর্মে রত ছিলেন। সিদ্ধি ও যশ লাভে সকল বর্ণের অভিরুচি ছিল। পরোপকার বাসনা, অসত্যে অনাসক্তি, লোভে দ্বেষ, পরনিন্দায় অনাদর, জীবে দয়া প্রকাশে অনুরাগ, ঈশ্বরে ভক্তি, নিত্যানিত্য-বস্তুবিচার, পরলোক বিষয়ে বুদ্ধি, প্রতিশ্রুতি রক্ষায় দৃঢ়তা, হৃদয়ে ঔদার্য এই সকল গুণ সকলেরই ছিল। রাজপ্রাসাদেও সকলেই এইরূপ সদভিপ্রায় ও পবিত্রচিত্ত হয়ে বাস করতো।

সেই নগরে ধনদ নামে এক বণিক বাস করতো। তার সম্পত্তির সীমা ছিল না। যে ব্যক্তি যে বস্তু চিন্তা করতো বণিকটির গৃহে তাই পাওয়া যেতো। এইভাবে সকল সম্পদের আশ্রয় হলেও বণিকের মনে হলো, সকলই অনিত্য। এই সংসার অসার, যে বস্তু দুর্লভ তাও অনিত্য। পত্নীর সঙ্গে মিলন আকাশ-নগরীর মতো মিথ্যা, যৌবন ও ধন মেঘমালার মতো স্বল্পকাশ স্থায়ী, আত্মীয়, পুত্র, দেহ প্রভৃতি বিদ্যুতের মতো চঞ্চল। সংসারে সকল সামগ্রীই ক্ষণিকের জন্য। আশ্রিত বা অনাশ্রিত, বান্ধবমাত্রেই বন্ধনের মূল।

আশ্রয়ও আপদের দ্বারসদৃশ। পুত্র, শত্রু, সকলই কর্মবন্ধনের মতো। অতএব এ সকল পরিত্যাগ করে নির্মল ধর্মের ভজনা করা কর্তব্য। একমাত্র ধর্মই সংসারিগণের আশ্রয়। শাস্ত্রেও বলে, ধর্মকে রক্ষা করলে ধর্মও রক্ষা করে। ধর্মকে বিনষ্ট করলে ধর্মও বিনাশ করে। অতএব ধর্মকে বিনাশ করা অনুচিত। যোগিগণ যা চিন্তা করেন সেই ধর্মই মানবগণকে সম্পদ দান করে। সে কারণ ধর্ম অপেক্ষা বন্ধু আর নেই। ধার্মিক অপেক্ষা সুখী এবং বিদ্বান্‌ও আর কাউকে দেখা যায় না। শাস্ত্রেও বলে, ধর্ম স্বর্গের সার সুখ দান করে, ধর্ম থেকে মানুষের শাশ্বত প্রীতি লাভ হয়, ধর্ম নিরন্তর স্বর্গ সুখাস্বাদের কলসের মতো। অতএব ধর্মলাভের জন্য অর্জিত বস্তু সৎপাত্রে দান করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের কর্তব্য। যা সৎপাত্রে দান করা যায়, তার ফল বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সাগর মধ্যে শুক্তিতে মেঘজল পতিত হলে যেমন মুক্তার উৎপত্তি হয়, সেই রকম পাত্রবিশেষে দান করলে সেই দানজনিত ধর্মও গুণান্তর প্রাপ্ত হয়ে উৎকর্ষ লাভ করে। বটবৃক্ষের ফল যেমন স্বল্প পরিমাণেও সুক্ষেত্রে পতিত হলে বহুস্থান জুড়ে বিস্তার লাভ করে তেমনি সুপাত্রে দত্ত ধনও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

বণিক এই রকম নানা কথা বিচার করে বেদবিশারদ ব্রাহ্মণদের ডাকিয়ে এনে তাঁদের মুখে শাস্ত্রোক্ত নানা দানের কথা শুনে সৎপাত্রে ঐ সমস্ত দান করে পবিত্র অন্তঃকরণে চিন্তা করলেন, 'আমি যে সকল ব্রতের অনুষ্ঠান করলাম, দ্বারাবতী নগরে গিয়ে যদি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করি তবেই তা সফল হবে।' এই স্থির করে দ্বারাবতী নগরে যাত্রা করলেন।

তারপর বণিক সমুদ্রতীরে পৌঁছে নাবিকদের ডেকে তাদের প্রচুর দ্রব্যাদি দান করে ভিক্ষুক, যোগী, অনাথ, বিদেশী ও দীন ব্যক্তিদের নৌকায় আরোহণ করিয়ে একটি ধর্মগোষ্ঠী করলেন। পরে তাদের সঙ্গে মিষ্ট আলাপ করতে করতে যাবার কালে সমুদ্রমধ্যে একটি ক্ষুদ্র পর্বত দেখলেন। সেই পর্বতে একটি বিশাল দেবালয় বিরাজিত।

বণিক সেই দেবালয়ে গিয়ে ভুবনেশ্বরী দেবীকে ষোড়শোপচারে পূজা ও নমস্কার করে বামদিকে দৃষ্টিপাত করেছেন, অমনি দেখলেন, একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষের ছিন্নশির দেহ পড়ে আছে এবং সম্মুখের ভিত্তির গায়ে লেখা আছে—'যদি কোন পরোপকারী মহাধৈর্যশীল ব্যক্তি আপনার কণ্ঠশোণিতে ভুবনেশ্বরীর অর্চনা করেন তাহলে এই স্ত্রীপুরুষ যুগল জীবিত হয়ে উঠবে।'

সেই লেখা পাঠ করে ধনদ সবিস্ময়ে আবার নৌকায় উঠে দ্বারাবতী গিয়ে কৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম করে স্তব করতে লাগলেন, 'এক-

সেই পর্বতে একটি বিশাল দেবালয় বিরাজিত
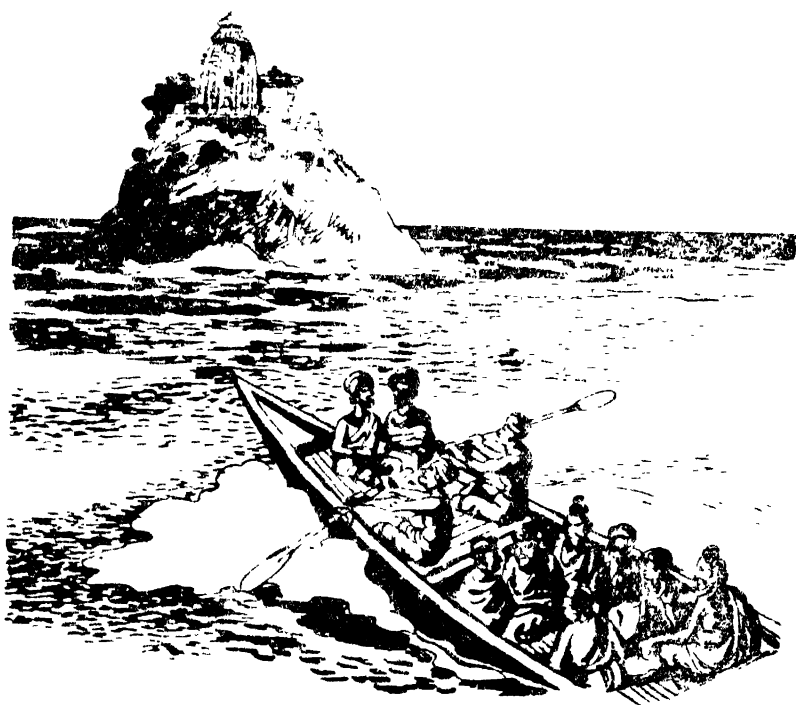
বারমাত্র কৃষ্ণকে প্রণাম করলে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল পাওয়া যায়। যে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণকে যে একবার প্রণাম করে তার পুনর্জন্ম হয় না।'

এইভাবে স্তব করে ষোড়শোপচারে কৃষ্ণের পূজা করে নিজ নগরে ফিরে এলেন। তারপর বন্ধুগণকে কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ করে একটি অপূর্ব দ্রব্য হাতে নিয়ে রাজদর্শনে যাত্রা করলেন। শাস্ত্রে বলে, দেবতা, রাজা ও গুরুকে রিক্তহস্তে দর্শন করতে নেই। যদি কোন কারণে কেউ অভ্যাগত হয় তাহলে তাকে ফল দান করবে। কারণ ফল দ্বারা ফল লাভ হয়। আরও কথা এই যে, স্ত্রী, প্রিয় বন্ধু, শিশু পুত্র ও কেউ কোন কারণে গৃহে উপস্থিত হলে তাদেরও রিক্তহস্তে দর্শন করবে না। সেজন্য বণিক রাজহস্তে কৃষ্ণপ্রসাদ ও একটি ভেট দান করে আসন গ্রহণ করলেন।

তারপর রাজা ধনদকে তীর্থক্ষেত্রে যাত্রা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে কোন অপূর্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে বললেন। বণিকও সমুদ্রমধ্যে ভুবনেশ্বরী দেবীর দেবালয় সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন।

তা শুনে রাজা পরম বিস্মিত হলেন। তিনি ধনদের সঙ্গে সেই দেবালয়ে গিয়ে দেখলেন, দেবতার বামদিকে দুটি কবন্ধ রয়েছে। তখন দেবতাকে মনে মনে স্মরণ করে রাজা যেমন স্বকণ্ঠে খড়্গ স্থাপন করলেন, অমনি কবন্ধ দুটির ছিন্ন শির তাদের দেহে যুক্ত হলো এবং তারা জীবিত হয়ে উঠলো।

এদিকে দেবতাও রাজার হাত থেকে খড়্গ আকর্ষণ করে বললেন, 'রাজন্! আমি প্রসন্ন হলাম, তুমি বর প্রার্থনা কর।'

রাজা বললেন, 'দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে এই স্ত্রী-পুরুষকে রাজ্য দান করুন।'

তখন দেবী সেই স্ত্রী-পুরুষকে রাজ্য দান করলেন। রাজাও ধনদের সঙ্গে নিজ নগরে ফিরে এলেন।"

পুতুল এই উপাখ্যান বর্ণনা করে ভোজরাজকে বললে, "রাজন্! আপনাতেও যদি পরোপকার করার ঐরূপ শক্তি থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা মৌন রইলেন।

অষ্টম পুতুল
লাবণ্যবতী

অষ্টম উপাখ্যান

আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্! শুনুন। রাজা বিক্রমাদিত্য ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ ও নানাগুণে পূর্ণ ছিলেন। তিনি চরমুখে অত্যন্ত কৌতুকাবহ বিষয়ের কথা শুনতেন। এ সম্বন্ধে কথিত হয়, গোরু গন্ধদ্বারা, ব্রাহ্মণেরা বেদদ্বারা, ভূপতিগণ চরদ্বারা ও সাধারণ লোকেরা চক্ষুদ্বারা দর্শন করে।

রাজন্! শুনুন। যিনি রাজা তাঁকে সকল লোকের অবস্থিতি জানতে হয়। সকল লোকের মনও জানা কর্তব্য। প্রজাগণকে সম্যক্ পালন, দুষ্টের দণ্ডবিধান, ন্যায়পথে ধন উপার্জন, প্রার্থীদের প্রতি সমান ব্যবহার ও রাজ্যরক্ষা এই পাঁচটি রাজার পক্ষে মহাযজ্ঞ স্বরূপ। শাস্ত্রেও বলে, দুষ্টের দণ্ড, সুজনের পূজা, ন্যায়পথে ধনাগার পুষ্টি, অর্থিগণের প্রতি অপক্ষপাতমূলক আচরণ ও রাজ্যরক্ষা—নৃপতিগণের পক্ষে এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ বলে নির্দিষ্ট। নরপতিগণের দৈবক্রিয়াই বা কী, শত্রুর সঙ্গে বিরোধই বা কী, দেবকর্ম ও জপ-হোমই বা কী! রাজাকে কেবল লক্ষ্য রাখতে হয়, রাষ্ট্রমধ্যে অশ্রুপাত না ঘটে।

এইভাবে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্য করছেন, এমন সময়ে একদিন কতকগুলো চর ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করে রাজার কাছে উপস্থিত হলে রাজা বললেন, 'খবর বল।'

তারা বললে, 'রাজন্! শুনুন। কাশ্মীর রাজ্যে এক মহাধনী বণিক আছেন। তিনি পঞ্চক্রোশ বিস্তৃত এক সরোবর খনন

করিয়েছেন। সেই সরোবরগর্ভে জলশায়ী লক্ষ্মীনারায়ণের শয়নস্থান রচনা করা হয়েছে। কিন্তু সেই সরোবরে জল ওঠেনি। তখন সেই বণিক আবার ব্রাহ্মণ দ্বারা চক্রপাণির উদ্দেশ্যে জপ, পূজা, হোম, অভিষেক প্রভৃতি সম্পন্ন করালেন। তবু জল ওঠেনি। তখন বণিক অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে সরোবরতীরে বসে প্রত্যহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলতে লাগলেন, 'হায়! কী উপায়ে জল উঠবে? আমার সকল শ্রম বিফল হলো।'

বণিক একদিন সরোবরতীরে বসে এই রকম চিন্তা করছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হলো, 'কী ব্যাপার? হে বণিকপুত্র! কেন তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছো? বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত কোন পুরুষের কণ্ঠরক্ত যদি এই সরোবরে সিঞ্চন করতে পারো তবেই নির্মল জলে পূর্ণ হবে। আর অন্য উপায় নেই।'

দৈববাণী শুনে বণিক সেই সরোবরতীরে একটি বিরাট অন্নছত্র স্থাপন করলেন। সেই অন্নছত্রে বণিকের স্বদেশবাসী সকলে প্রত্যহ আহারের জন্য উপস্থিত হতে লাগলো। সেখানে কার্য নির্বাহের জন্য যারা নিযুক্ত ছিল তারা বিদেশবাসীদের সম্মুখে এই বলতে লাগলো—যে নিজ কণ্ঠরক্ত এই সরোবরে সেচন করবে তাকে শতভার সুবর্ণ দেওয়া হবে।

সকলেই একথা শুনলো, কিন্তু কেউই সহসা স্বীকৃত হলো না। এই মহাচিত্র দেখেছি।'

তাদের কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য স্বয়ং সেখানে গেলেন। সেই জলাশয়ে মনোহর বিষ্ণুমন্দির ও বিশাল সরোবর দেখে বিস্মিত হয়ে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, যদি আমার কণ্ঠরক্তে এই সরোবর সিক্ত করি তাহলে এটি জলে ভরে উঠবে। তখন সকলেরই মহা উপকার হবে। শতবর্ষ জীবিত থাকলেও আমার এই দেহ বিনষ্ট হবে। অতএব মহাপুরুষের শরীরের মমতা করা উচিত নয়। শাস্ত্রেও বলে, শতবর্ষ প্রাণ ধারণ করে শয্যায় শয়ন করে থাকলেও

এই দেহ অবশ্যই বিনষ্ট হবে। দেহে সর্বদা বিপদ সুলভ। সুতরাং সমাজে নিন্দা হয় দেহের প্রতি এমন মমতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। তিনিই লোকাতীত পুরুষ দেহের প্রতি যাঁর মমতা নেই। শরীর নিয়ত ব্যাধি ও শোকের আগার এবং পতনোন্মুখ।

এইরূপ নানা কথা চিন্তা করে পূর্বোক্ত মন্দিরের জলশায়ী বিষ্ণুর পূজা ও তাঁকে প্রণাম করে, 'হে জলদেবতা! আপনি বত্রিশটি লক্ষণ-যুক্ত পুরুষের কণ্ঠরক্ত চান। অতএব আমার কণ্ঠরক্তে তৃপ্ত হয়ে এই

রাজা তীরে উঠতেই সরোবরটি জলে ভরে উঠলো

সরোবর জলপূর্ণ করুন।' এই বলে রাজা বিক্রমাদিত্য যেমন নিজকণ্ঠে খড়্গাঘাত করতে যাবেন অমনি দেবতা তা ধরে ফেললেন এবং বললেন, 'হে বীর! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হলাম। তুমি বর প্রার্থনা কর।'

রাজা বললেন, 'যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই সরোবর জলপূর্ণ করুন।'

দেবী আবার বললেন, 'রাজন্। তুমি এই সরোবর থেকে উঠে যাও। তারপর যেমন দৃষ্টিপাত করবে, অমনি এই সরোবর জলে ভরে উঠবে।'

রাজা সেই শুনে সরোবর থেকে তীরে উঠতেই সরোবরটি জলে ভরে উঠলো। রাজা বিক্রমাদিত্যও নিজ নগরে ফিরে এলেন।"

এই উপাখ্যান বর্ণনা করে ভোজরাজকে পুতুলটি বললে, "রাজন্! আপনার যদি এইরূপ উদারতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

শুনে ভোজরাজ মৌন রইলেন।

নবম উপাখ্যান

নবম পুতুল কামকলিকা

আর একটি পুতুল বললে, 'রাজন্। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্য করছেন তখন তাঁর মন্ত্রী ছিলেন ভট্টি, গোবিন্দ উপমন্ত্রী, চন্দ্রশেখর সেনাপতি এবং পুরোহিত ছিলেন ত্রিবিক্রম। ত্রিবিক্রমের পুত্রের নাম কমলাকর। পিতৃপ্রসাদে কমলাকর ঘৃতান্ন ভোজন, বসনভূষণ ও তাম্বুলাদি দ্বারা শরীর পোষণ করে বিষয়সুখ ভোগ করতেন।

একদিন পিতা কমলাকরকে বললেন, 'তুই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে কেন এমন স্বেচ্ছাচারী হয়েছিস্? আত্মাকে শত শত জন্ম নানা যোনিতে ভ্রমণ করতে হয়। মহাপুণ্যফলে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়ে থাকে। তুই সেই ব্রাহ্মণকুলে জন্মেও দুষ্টাচারী হয়েছিস্। সর্বদা বাইরে বাইরে থাকিস্, কেবল আহারের সময়ে আসিস্। এ কাজ তোর পক্ষে অনুচিত। এখন তোর বিদ্যাশিক্ষার সময়। এ সময়ে যদি বিদ্যাভ্যাস না করিস্, তাহলে তোকে মহাকষ্ট ভোগ করতে হবে। শাস্ত্রেও বলে—যে বাল্যাবস্থায় বিদ্যাভ্যাস না করে, যৌবনে কামার্ত হয়ে ভ্রষ্টচরিত্র হয়, শীতকালে বস্ত্রহীন ব্যক্তি যেমন কষ্ট পায়, তাকেও বৃদ্ধাবস্থায় অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করতে হয়।

যাদের বিদ্যা নেই, তপস্যা নেই, দান নেই, শীলতা নেই, পুণ্য নেই, ধর্ম নেই তারা মর্তলোকে ভুবনের ভারস্বরূপ। তারা মনুষ্যদেহে পশুরূপে বিচরণ করে। সংসারে পুরুষের বিদ্যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভূষণ আর নেই। বিদ্যা মানুষের সমুজ্জ্বল রূপ ও গুপ্তধনের

মতো। বিদ্যা যশ ও সুখ দান করে। বিদ্যা গুরুর গুরু। বিদ্যা বিদেশে শ্রেষ্ঠ বন্ধু। বিদ্যা রাজসমীপে পূজনীয়, বিদ্যার সমান ধন আর নেই। বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ দেবতা। বিদ্যাহীন ব্যক্তি পশুর সমান। বিদ্যাহীনের বিশাল কুলে জন্মগ্রহণ করে ও দেহধারণ করে লাভ কী? বিদ্বান্ ব্যক্তি অকুলীন হলেও দেবগণও তার পূজা করেন। যতদিন আমি জীবিত আছি ততদিন তোর বিদ্যাশিক্ষা করা উচিত। বিদ্যাশিক্ষা করলে সেই বিদ্যা তোর বন্ধুর কাজ করবে।

শাস্ত্রেও বলে, বিদ্যা মাতার ন্যায় রক্ষা করে, পিতার ন্যায় হিতকর কার্যে নিযুক্ত করে, পত্নীর ন্যায় কষ্ট দূর করে, চিত্ত বিনোদন করে, বিদ্যাই অর্থার্জন করে দেয়। সুতরাং কল্পলতার মতো বিদ্যা কী না সাধন করে দেয়?'

পিতার মুখে এই কথা শুনে কমলাকর অনুতপ্ত হয়ে মনে মনে চিন্তা করলেন, 'যদি সর্বজ্ঞ হতে পারি তবেই এসে আবার পিতার মুখ দর্শন করবো।' এই চিন্তা করে তিনি কাশ্মীর দেশে চলে গেলেন।

সেখানে চন্দ্রমৌলি ভট্ট নামে উপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে বললেন, 'প্রভো! আমি মূর্খ। আপনার নাম শুনে বিদ্যা শিক্ষার জন্য আপনার কাছে এসেছি। যাতে আমার বিদ্যাশিক্ষা হয় আপনি শ্রীমান্ কৃপা করে তা করুন।' এই বলে কমলাকর আবার তাঁকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলেন।

তখন উপাধ্যায় স্বীকৃত হলেন। কমলাকরও অহর্নিশি তাঁর সেবা করতে লাগলেন। কথিত আছে, গুরুসেবা, প্রভূত অর্থ ও বিদ্যা সাহায্যেই বিদ্যালাভ হয়, চতুর্থ উপায় আর নেই।

এইভাবে গুরুসেবা করতে করতে বহুকাল গত হলো। একদিন উপাধ্যায় কৃপা করে তাঁকে সিদ্ধসারস্বত মন্ত্রের উপদেশ দান করলেন। সেই উপদেশে কমলাকর সর্বজ্ঞ হয়ে উপাধ্যায়ের অনুমতি নিয়ে নিজ নগরে যাত্রা করলেন। যাবার পথে তিনি

কাঞ্চীনগরে এসে উপস্থিত হলেন। নরেন্দ্রসেন সেই নগরের রাজা। সেই নগরে নরমোহিনী নামে একটি স্ত্রীলোক বাস করে। সে রূপে অদ্বিতীয়া। যে তার বাড়িতে একরাত্রি বাস করে বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস এসে তার রক্ত পান করে। সে আর বাঁচে না।

কমলাকর এই কৌতুক দেখে নিজ নগরে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে তাঁর মাতাপিতার খুব আনন্দ হলো। পরদিন কমলাকর পিতার সঙ্গে রাজভবনে গিয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। সভায় তাঁর বিদ্যাবুদ্ধিও দেখালেন।

তারপর রাজা বিক্রমাদিত্য কমলাকরকে বস্ত্রাদিদানে সম্মান করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কমলাকর! তুমি যে দেশে গিয়েছিলে সেখানে আশ্চর্য কিছু দেখেছো কী?'

কমলাকর বললেন, 'রাজন্! সে দেশে কিছুই দেখিনি। কিন্তু গৃহে আসবার পথে কাঞ্চীনগরে এক অপূর্ব কৌতুক দেখেছি।'

রাজা বললেন, 'কি দেখেছো বল।'

কমলাকর বললেন, 'কাঞ্চী নগরে নরমোহিনী নামে একটি স্ত্রীলোক আছে। যে তাকে দেখে সেই উন্মাদ হয়। যে তার গৃহে বাস করে বিন্ধ্যাচলবাসী একটি রাক্ষস এসে তার রক্ত পান করে আর নরমোহিনীর রূপ দেখে আশ্চর্য হয়। রাক্ষস যার রক্ত পান করে তার মৃত্যু হয়। আমি এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছি।'

রাজা বললেন, 'তবে এস, আমরা দুজনে সেখানে যাই।'

এই বলে রাজা বিক্রমাদিত্য কমলাকরের সঙ্গে কাঞ্চীনগরে এলেন এবং নরমোহিনীর রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে তার গৃহে গেলেন।

নরমোহিনী রাজার পাদপ্রক্ষালন, তৈলাদি ও সুগন্ধ পুষ্পাদি দান করলো। তারপর রাজাকে বললে, 'রাজন্! আজ আমি ধন্য হলাম। আপনার চরণপ্রসাদে আমার গৃহ পবিত্র হলো। প্রভো! আজ আপনি আমার গৃহে ভোজন করুন।'

রাজা বললেন, 'আমি এইমাত্র আহার করে আসছি।'

তখন নরমোহিনী রাজাকে তাম্বুল দিলে।

এইভাবে রাত্রির এক প্রহর গত হলে নরমোহিনী নিদ্রা গেল। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে সেই রাক্ষসটি এলো। রাক্ষসের পদশব্দ শুনে রাজা পিছনে লুকিয়ে রইলেন। রাক্ষস যখন উপস্থিত হলো তখন ঘরে দীপ জ্বলছিল। রাক্ষস দেখলো, ঘরে কেবল নরমোহিনী রয়েছে আর কেউ নেই। সে দেখলো, মঞ্চে কেবল নরমোহিনী একা

'আপনার চরণপ্রসাদে আমার গৃহ পবিত্র হলো।'

নিদ্রিত আছে। কাউকে না দেখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সে যখন বেরিয়ে আসে রাজা বিক্রমাদিত্য তাকে মেরে ফেললেন।

মরবার সময় রাক্ষস বিকট চীৎকার করলো। সেই কোলাহল শুনে নরমোহিনীর নিদ্রা ভেঙে গেল। রাক্ষসকে নিহত দেখে

সে রাজাকে বললে, 'আপনার কার্যে আমি নির্ভয় হলাম। আজ থেকে রাক্ষসের উপদ্রব দূর হলো। আপনার কৃত উপকার আমি কেমন করে উত্তীর্ণ হবো? আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করবো।'

রাজা বললেন, 'আমি যা বলবো তুমি যদি তাই কর তাহলে এই কমলাকরের ভজনা কর।'

নরমোহিনী কমলাকরকে ভজনা করতে লাগলো। রাজা বিক্রমাদিত্যও উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন।"

এই উপাখ্যানটি বর্ণনা করে পুতুল ভোজরাজকে বললে, "রাজন্। আপনাতে যদি সেইরূপ ধৈর্যগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ মৌন রইলেন।
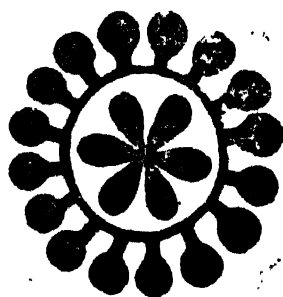
দশম পুতুল চণ্ডিকা

দশম উপাখ্যান

অন্য একটি পুতুল বললে, "রাজন্‌! শুনুন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্য পালন করছেন তখন উজ্জয়িনীতে একটি যোগী উপস্থিত হলেন। সেই যোগী বেদশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষ, গণিত, সঙ্গীত-বিদ্যা এবং সর্ব কলাবিদ্যায় পারদর্শী। বেশি কী, তাঁর সমান আর কেউই ছিল না। তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ সর্বজ্ঞ।

সেই যোগীর সুখ্যাতি শুনে তাঁকে আহ্বান করবার জন্য বিক্রমাদিত্য তাঁর পুরোহিতকে পাঠালেন।

পুরোহিত যোগীর কাছে গিয়ে নমস্কার করে বললেন, 'স্বামিন্‌! রাজা আপনাকে ডাকছেন। সেখানে চলুন।'

যোগী বললেন, 'চলুন।' তারপর তিনি রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'রাজন্‌! আপনি যদি মন্ত্রসাধন করেন তাহলে জরামরণ-রহিত হতে পারেন।'

রাজা বললেন, 'তবে আপনি আমাকে সেই মন্ত্রের উপদেশ দিন। আমি তার সাধন করি।'

তখন যোগী রাজাকে সেই মন্ত্রের উপদেশ দিয়ে বললেন, 'রাজন্‌! এক বৎসর ব্রহ্মচারী ভাবে থেকে এই মন্ত্র জপ ও দূর্বাদল দিয়ে মন্ত্রজপের দশমাংশ হোম করতে হবে। যখন পূর্ণাহুতি দান করা হবে তখন হোমকুণ্ড থেকে একটি ফল হাতে নিয়ে একজন পুরুষ উঠে আপনাকে সেই ফল দান করবে। সেই ফল ভক্ষণ

করলেই আপনি জরামরণ-রহিত হবেন। আপনার দেহ বজ্রের মতো কঠিন হবে।'

এই উপদেশ দান করে যোগী স্বস্থানে চলে গেলেন।

তারপর রাজা বিক্রমাদিত্য গ্রামের বাইরে এক জায়গায় ব্রহ্মচারীভাবে থেকে এক বৎসর ধরে সেই মন্ত্র সাধন করে দূর্বাদল

হোমকুণ্ড থেকে এক পুরুষ বার হয়ে রাজার হাতে একটি দিব্য ফল দান করলেন।

দিয়ে হোমাগ্নিতে জপের দশমাংশ দান করলেন। যখন পূর্ণাহুতি দান করা হলো তখন হোমকুণ্ড থেকে এক পুরুষ বার হয়ে রাজার হাতে একটি দিব্য ফল দান করলেন।

রাজা সেই ফল নিয়ে নগরের রাজপথ দিয়ে যখন চলেছেন তখন কুষ্ঠব্যাধিতে বিশীর্ণশরীর এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে আশীর্বাদ

করে বললেন, 'রাজন্‌! রাজা লোকের মাতাপিতাস্বরূপ। শাস্ত্রেও বলে, রাজা বন্ধুহীনের বন্ধু, চক্ষুহীনের চক্ষু। রাজা মাতাপিতার মতো এবং সকলের দুঃখহারী গুরু। আপনি জগতের দুঃখ দূর করছেন। অতএব আমার দুঃখ দূর করুন। এই কুষ্ঠব্যাধি দ্বারা আমার শরীর বিনষ্ট হচ্ছে। শরীর নাশ হলে সকল কার্যই বিনষ্ট হয়। কারণ, শরীরই ধর্মকর্মের একমাত্র সাধন। কথিত হয় যে, ধর্মসাধনের পূর্বে শরীর। অতএব যাতে আমার এই দেহ নিরাময় ও ভোগযোগ্য হয় আপনি তাই করুন।'

রাজা এই কথা শুনে ব্রাহ্মণকে সেই ফলটি দান করলেন। ব্রাহ্মণ পরম সন্তুষ্টচিত্তে স্বস্থানে চলে গেলেন। রাজাও নিজ ভবনে এলেন।"

এই উপাখ্যান বর্ণনা করে পুতুল ভোজরাজকে বললে, "রাজন্‌! আপনাতে যদি এইরূপ উদারতা ও ধৈর্য থাকে তবে আপনি এই সিংহাসনে বসুন।"

পুতুলের কথা শুনে ভোজরাজ মৌন রইলেন।

একাদশ পুতুল
বিদ্যাধরী

একাদশ উপাখ্যান

আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্! শুনুন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে খল, তস্কর বা পাপকর্মে নিরত কেউই ছিল না। যে রাজা সর্বদা রাজ্যের চিন্তা করেন, শক্তিমান শত্রুকে পরাজিত করবার ভাবনায় নিমগ্ন থাকেন, তিনি দিবারাত্রি নিদ্রা যান না। শাস্ত্রে বলে, যে লোক অর্থের জন্য কাতর তার পিতাও নেই, বন্ধুও নেই; যে লোক লালসাতুর তার ভয়ও নেই, লজ্জাও নেই; যে চিন্তায় কাতর তার সুখও নেই, নিদ্রাও নেই এবং যে ব্যক্তি ক্ষুধাতুর তার বলও নেই, তেজও নেই।

রাজা বিক্রমাদিত্য সে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না। তিনি সকল রাজাকে নিজ অধীনে আশ্রিত করে তাঁদের প্রতি আজ্ঞা দান করে রাজ্য শাসন করতেন। শাস্ত্রে বলে, আজ্ঞা রাজ্যের ফল, ব্রহ্মচর্যের ফল তপস্যা, জ্ঞান বিদ্যার ফল এবং ধনের ফল দান ও ভোগ।

কোন সময়ে বিক্রমাদিত্য মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যভার দিয়ে যোগীবেশে দেশান্তরে গেলেন। যেখানে আনন্দ লাভ করেন সেখানেই কিছুদিন থাকেন, যেখানে আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায় সেখানে কিছুদিন কাটে।

এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে একদিন সূর্য অস্ত গেল। রাজা মহারণ্য মধ্যে বৃক্ষমূলে আশ্রয় নিয়ে রাত্রি যাপন করলেন।

সেই বৃক্ষে চিরঞ্জীবী নামে একটি বৃদ্ধ পক্ষী বাস করতো। তার পুত্র-পৌত্রগণ দেশান্তরে গিয়ে নিজ নিজ উদর পূরণ করে সন্ধ্যাকালে প্রত্যেকেই একটি করে ফল নিয়ে ফিরে আসতো। বৃদ্ধ চিরঞ্জীবীকে তারা প্রত্যহ ঐরকম ফল এনে দিত। শাস্ত্রে বলে, মনু বলেছেন, বৃদ্ধ মাতাপিতা, সাধ্বী ভার্যা, শিশুপুত্রকে শত অপকর্ম করেও পালন করবে।

তারপর রাত্রে চিরঞ্জীবী সুখে আসীন হয়ে পাখিদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। রাজাও বৃক্ষমূলে থেকে সেই কথা শুনতে লাগলেন।

চিরঞ্জীবী বললে, 'হে পুত্রগণ! তোমরা নানা জায়গায় ভ্রমণ কর। কোথাও কিছু আশ্চর্য দেখেছো কী?'

তখন একটি পাখি বললে, 'আমি কোথাও কিছুই আশ্চর্য দেখিনি। কিন্তু আজ আমার মনে মহা দুঃখের উদয় হয়েছে।'

চিরঞ্জীবী বললে, 'কেন দুঃখ হয়েছে বল।'

সে বললে, 'কেবল বলায় কী হবে?'

চিরঞ্জীবী বললে, 'হে পুত্র! যে দুঃখী সে সুহৃদের কাছে দুঃখ নিবেদন করলে সুখী হয়।'

তার কথা শুনে পাখিটি দুঃখের কারণ বলতে আরম্ভ করলো।

সে বললে, 'হে তাত! শুনুন। উত্তরদেশে শৈবালঘোষ নামে একটি পর্বতের কাছে পলাশ নামে নগর আছে। সেই পর্বতবাসী এক রাক্ষস প্রতিদিন নগরে এসে সম্মুখে যে পুরুষকেই দেখতে পায় তাকেই পর্বতে নিয়ে গিয়ে ভক্ষণ করে। একদিন সেই গ্রামবাসি-গণ তাকে বলে, 'হে বকাসুর! তুমি যাকেই সম্মুখে পাও তাকেই যথেচ্ছ ভক্ষণ করো না। আমরা তোমার আহারের জন্য প্রত্যহ একটি করে পুরুষ দেবো।' তাদের কথাতেই বকাসুর অঙ্গীকার করলো।

তারপর পালা করে প্রত্যহ এক এক বাড়ি থেকে এক একটি

পুরুষকে রাক্ষসের আহারের জন্য দেওয়া হতে লাগলো। এই ভাবে বহুকাল কেটেছে। আজ পূর্বজন্মে আমার বন্ধু এক ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত। তাঁর একটি মাত্র পুত্র। পুত্রকে দান করলে সন্তানবিয়োগ ঘটে ; নিজকে দান করলে, স্ত্রী বিধবা হয়। বৈধব্য মহা দুঃখের। আবার, পত্নীকে দান করলে গৃহ শূন্য হয়। এই হলো আমার মহা দুঃখের কারণ।'

তার কথা শুনে সেখানকার পাখিরা বললে, 'বন্ধুর দুঃখে যে দুঃখী হয় সেই প্রকৃত সুহৃদ্। এই হলো প্রকৃত মিত্রতা। যে সুহৃদের সুখে সুখী, সুহৃদের দুঃখে দুঃখী হয় সেই প্রকৃত বন্ধু। চন্দ্রের উদয় হলে সিন্ধু উদ্বেল হয়, চন্দ্র অস্ত গেলে ক্ষীণ হয়ে পড়ে। সুহৃদের প্রকৃতিই এই রকম।'

পাখিদের এই কথা শুনে রাজা পলাশ নগরে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে বধ্যশিলা দেখে ব্রাহ্মণকে অভয় দিয়ে কাছেই সরোবরে স্নান করে বধ্যশিলাখানির উপর বসলেন।

সেই সময়ে রাক্ষস এসে সহাস্যমুখ পুরুষকে দেখে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'হে মহাসত্ত্ব! তুমি সকলের দুঃখহারী বন্ধুর মতো। কারণ, তুমি বিশ্বের দুঃখ হরণ করছো। অতএব এই পাপকার্য করলে আমার শরীর বিনষ্ট হবে। শরীর নাশ হলে অনুষ্ঠানও বিনষ্ট হবে। কারণ, একমাত্র শরীরই সকল ধর্মকার্যের সাধন। এই শিলায় যে প্রত্যহ এসে বসে সে আমার আসার আগেই মৃতপ্রায় হয়। যার মৃত্যুকাল আসন্ন তার ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন হয়। কিন্তু তুমি আরও কান্তিমান হয়ে হাসছো। বল, তুমি কে?'

রাজা বললেন, 'সে সম্বন্ধে বিচার করে কী হবে? পরের জন্য আমি শরীর দান করছি। তুমি নিজ কার্য শেষ কর।'

তখন রাক্ষস নিজ মনে বিচার করতে লাগলো, 'এ লোকটি সাধু ; লোকটি নিজের সুখভোগেচ্ছা পরিহার করে পরদুঃখে দুঃখী হয়ে

এখানে এসেছে। শাস্ত্রে বলে, সাধুরা নিজ সুখ-দুঃখ-ভোগেচ্ছা ত্যাগ করে পরদুঃখে দুঃখী হয়ে থাকেন।'

এই রকম বিচার করে সে রাজাকে বললে, 'হে মহাপুরুষ! তুমি যখন পরের জন্য শরীর দান করছো তখন তোমার এই শরীর প্রশংসাযোগ্য। কারণ পশুগণও কেবল নিজ উদর পূর্ণ করে জীবিত থাকে, কিন্তু যে পরের জন্য জীবন ধারণ করে তার জীবনই প্রশংসার। যে সাধু ব্যক্তিগণ পরের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ তাদের পক্ষে এ

রাক্ষস রাজাকে বললে, 'হে মহাসত্ত্ব! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।'

রকম কাজ বিচিত্র নয়। কেবল স্বদেহ শীতল করবার জন্য চন্দনবৃক্ষের জন্ম হয় না। হে মহাসত্ত্ব! এই পরোপকারের ফলে তুমি সকল রকমের সম্পদ লাভ করবে। শাস্ত্রেও বলে, যে পুরুষ পরোপকার

সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করে সে সকল রকমের সম্পদ ও পরলোকে পরমপদ পায়। যে সকল সাধু পরোপকারে নিরত এবং নিজ স্বার্থসুখে নিস্পৃহ ধরায় তাঁদের জন্ম জগতের হিতের জন্য।'

এই বলে রাক্ষস রাজাকে বললে, হে মহাসত্ত্ব! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।'

রাজা বললেন, 'হে রাক্ষস! যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাক, তাহলে আজ থেকে মানুষ মারা পরিত্যাগ কর। আমি আরও উপদেশ দিচ্ছি, শোন। তোমার নিজের প্রাণ যেমন প্রিয়, সকল জীবেরই সেই রকম। অতএব মৃত্যুভয় থেকে জীবগণকে পরিত্রাণ করা বিদ্বানের কর্তব্য। আরও—এই ঘোর সংসারসাগরে জীবগণ নিত্য জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখে ক্লেশ পাচ্ছে এবং মর্তবাসিগণ সতত মৃত্যুভয়ে ভীত। 'মরব' এই চিন্তা করে পুরুষ যেরকম দুঃখ পায়, তা অনুমান বা বর্ণনা করতেও কেউ কখন সক্ষম হয় না। তারপর, নিজের প্রাণ যেমন প্রিয়, পরের প্রাণও তেমনি; কাজেই নিজের প্রাণ যেমন রক্ষণীয় বলে দেখবে, পরের প্রাণও তেমনি রক্ষা করবে।'

রাজা রাক্ষসকে এই নির্দেশ দিলে রাক্ষস সেদিন থেকে জীবহত্যা ত্যাগ করলো। রাজাও নিজ নগরে ফিরে এলেন।"

এই উপাখ্যান বর্ণনা করে পুতুল ভোজরাজকে বললে, "যদি আপনাতেও এই রকম পরোপকারাদি গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা চুপ করে রইলেন।

দ্বাদশ পুতুল জ্ঞাবতী

দ্বাদশ উপাখ্যান

আবার আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্! শুনুন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজত্ব করছেন, তখন তাঁর রাজধানীতে ভদ্রসেন নামে এক বণিক বাস করতো। সেই ভদ্রসেনের সম্পদের সীমা ছিল না। তারপর সে ব্যয়শীলও ছিল না। কিছুকাল পর ভদ্রসেনের মৃত্যু হলো। তার পুত্র পুরন্দর পিতার সর্বস্ব পেয়ে দান করতে লাগলো।

একদিন পুরন্দরের প্রিয় মিত্র ধনদ বললে, 'হে পুরন্দর! তুমি বেনের ছেলে হয়ে ক্ষত্রিয়ের ছেলের মতো ব্যয় করছো। এটা বণিক-বংশজাত ব্যক্তির লক্ষণ নয়। যে-কোন উপায়ে অর্থসংগ্রহ করা বণিকপুত্রের কর্তব্য; কপর্দকও ব্যয় করা তার কর্তব্য নয়! উপার্জিত দ্রব্য কোন-না-কোন সময়ে বিপদে পুরুষের কাজে লাগে। কাজেই আপদ নিবারণের জন্য ধন সংগ্রহ করা কর্তব্য। শাস্ত্রে বলে, আপদ নিবারণের জন্য ধন রক্ষা করবে; ধনদ্বারা স্ত্রী এবং স্ত্রী ও ধনদ্বারা আত্মাকে রক্ষা করবে।'

এই কথা শুনে পুরন্দর বললে, 'হে ধনদ! উপার্জিত ধন এক সময়ে বিপদে উপকারে আসতে পারে যা বললে, তা অসার কথা। যখন বিপদ আসে তখন উপার্জিত ধনও নাশ হয়। এজন্য যা গত হয়েছে তার জন্য শোক এবং আগামী বিষয়ের জন্য চিন্তা করা কর্তব্য নয়। বরং বর্তমান বিষয়ের চিন্তা করবে। যা ভবিতব্য তা অনায়াসে ঘটবে। যা গত হয়েছে, তা তো গত হয়েছেই।

শাস্ত্রেও বলে, নারিকেল ফলে যেমন জল সঞ্চার হয়, ভবিতব্যও তেমনি ঘটবেই ঘটবে। আর যা যাবার তা গজভুক্ত কয়েৎবেলের মতো গেছেই। যা হবার নয় তা কখনই হয় না, যা ভবিতব্য তা বিনা যত্নেও ঘটে। যার ভবিতব্যতা নেই, তা করতলগত হলেও বিনষ্ট হয়।'

পুরন্দরের এই কথা শুনে ধনদ নিরুত্তর রইলো। তারপর পুরন্দর পিতার সমস্ত ধন ব্যয় করলো। তখন নির্ধন পুরন্দরকে তার বন্ধুগণ কিছু জিজ্ঞেস করলো না। তার সঙ্গে মেলামেশাও করলো না।

তাতে পুরন্দর মনে মনে চিন্তা করলো, যতদিন আমার হাতে ধন ছিল ততদিন আমার বন্ধুরা আমার সেবক ছিল। আজকাল আমার সঙ্গে কথাও বলে না। যার অর্থ আছে তারই মিত্র আছে।

শাস্ত্রেও বলে, যার ধন আছে তার মিত্রও আছে; যার অর্থ আছে তারই বান্ধব আছে; যার অর্থ আছে সে ব্যক্তিই সংসারে পুরুষ বলে গণ্য; যার অর্থ আছে সে ব্যক্তিই পণ্ডিত বলে পরিচিত। পুরুষ নির্ধন হলে বন্ধুগণ আর পূর্বের মতো থাকে না। যে সকল পরিজন পূর্বে তার আশ্রয়ে থাকতো তারা স্বচ্ছন্দে তার আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যায়; সুহৃদ্‌গণ চঞ্চল হয়ে তাকে ছেড়ে যায়। অন্যের কথা দূরে থাক ভার্যাও অনবরত তার সঙ্গে বিবাদ করে। যার ধন আছে সেই কুলীন, সেই পণ্ডিত, সেই শাস্ত্রজ্ঞ ও গুণজ্ঞ, সেই বক্তা এবং সেই দর্শনীয়। সকল গুণ কাঞ্চনকেই আশ্রয় করে। আগুন যখন বন দহন করে, বায়ু তখন তার সখা হয়; কিন্তু আগুন যখন ক্ষীণ হয় তখন সেই বায়ুই দীপ নির্বাণের কারণ। অতএব ক্ষীণ হলে কার গৌরব থাকে? কাজেই দারিদ্র্য অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

পুরন্দর এই বিচার করে দেশান্তরে চলে গেল। নানাস্থানে ভ্রমণ করতে করতে সে হিমাচলের কাছে এক নগরে এলো। সেই নগরের অনতিদূরে একটি বাঁশবন ছিল। পুরন্দর গ্রামের ভিতর

গিয়ে রাতে একটি বাড়ির বেদীতে শুয়ে রইলো। অর্ধরাত্রে সেই বাঁশবনে একটি স্ত্রীলোকের কান্নার হাহাকারধ্বনি উঠলো। পুরন্দর শুনতে পেল, 'হে মহাজন! আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর। এক রাক্ষস আমাকে মারছে।' এই রকম আর্তনাদ হচ্ছে।

তারপর প্রভাতে সে গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করলো, 'মহাশয়গণ! রাত্রে বাঁশবনে একটি স্ত্রীলোক আর্তনাদ করে কেন?'

গ্রামবাসীরা বললে, 'ঐ বাঁশবনে প্রত্যহ ঐ রকম কান্নার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেউই ভয়ে ওখানে যায় না বা ঐ সম্বন্ধে বিচারও করে না।'.

তারপর পুরন্দর নিজ নগরে ফিরে এসে রাজার সঙ্গে দেখা করলো। রাজা বিক্রমাদিত্য তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুরন্দর! তুমি দেশান্তরে গিয়ে কিছু আশ্চর্য জিনিস দেখেছো কী?'

পুরন্দর রাজার কাছে সেই বাঁশবনের আশ্চর্য বিষয়ের কথা বর্ণনা করলো। রাজা এই কৌতুককর ঘটনা শুনে তার সঙ্গে সেই নগরে গেলেন এবং রাত্রে বাঁশবনে স্ত্রীলোকের কান্না শুনে সেই বনে গিয়ে ঢুকলেন। দেখলেন, এক রাক্ষস একটি অনাথা স্ত্রীলোককে মারছে। স্ত্রীলোকটির মূর্তি ভীষণ; সে কাঁদছে। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য অগ্রসর হয়ে রাক্ষসকে বললেন, 'রে পাপিষ্ঠ! এই অনাথা স্ত্রীলোকটিকে কেন মারছিস্?'

রাক্ষস বললে, 'তোমার তা বিচারের দরকার কী? তুমি নিজের পথ দেখ। না হলে আমার হাতে মরবে।'

তখন দুজনে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। রাজা রাক্ষসকে মেরে ফেললেন। তখন সেই স্ত্রীলোকটি রাজার কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়লো; বললে, 'প্রভু! আপনার প্রসাদে আমার শাপ মোচন হলো। আপনি আমাকে মহা দুঃখসাগর থেকে উদ্ধার করলেন।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে?'

স্ত্রীলোকটি বললে, 'এই নগরে এক মহাধনী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

আমি তাঁর স্ত্রী। আমি তাঁর সঙ্গে প্রিয় ব্যবহার করতাম না। কিন্তু তিনি আমাকে ভালবাসতেন। তিনি আমাকে ডাকলেও আমি রূপের গর্বে তাঁর কাছে যেতাম না। তিনি সারাজীবন মনোত্মঃখে কাটিয়ে মরবার সময়ে আমাকে এই বলে শাপ দেন—'তুই যেমন সারাজীবন আমাকে ত্মঃখ দিলি তেমনি বাঁশবনে থেকে তুইও

'রে পাপিষ্ঠ! এই অনাথা স্ত্রীলোকটিকে কেন মারছিস্?'

কষ্ট পাবি। প্রতি রাত্রে এক বিকটাকার রাক্ষস এসে তোকে মারবে।'

আমি তখন শাপ মোচনের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই। বলি—'নাথ! আমার শাপমোচন করে দিন।'

তিনি বলেন, 'যদি পরোপকারী মহাধৈর্যসম্পন্ন কোন পুরুষ

এখানে এসে সেই রাক্ষসকে বধ করেন, তুমি তাঁর চরণে প্রণাম করলেই শাপমুক্ত হবে। আমার এই যে ধনসম্পত্তি রইলো এসব সেই মহাপুরুষকে দান করো।' এই বলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। অতএব এখন আমি আপনার অধীন হলাম। আপনি এই ধনপূর্ণ কলসী গ্রহণ করুন।'

রাজা এই কথা শুনে সেই ধনপূর্ণ কলসী ও স্ত্রীলোকটি পুরন্দরকে দান করে তার সঙ্গে উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন।"

পুতুলটি এই উপাখ্যান বর্ণনা করে ভোজরাজকে বললে, "রাজন্! যদি আপনাতে সেই রকম ধৈর্য ও ঔদার্য থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

শুনে ভোজরাজ চুপ করে রইলেন।

ত্রয়োদশ পুতুল
জনমোহিনী

ত্রয়োদশ উপাখ্যান

আবার অন্য পুতুল বললে, "শুনুন রাজন্! কোন এক সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য মন্ত্রিগণের হাতে রাজ্যভার দিয়ে নিজে পৃথিবীপর্যটনে বার হলেন। গ্রামে এক রাত্রি, নগরে পাঁচ রাত্রি যাপন করতে লাগলেন।

এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে তিনি একদিন এক নগরে এলেন। সেই নগরের কাছে নদীতীরে একটি দেবালয় ছিল। সেই দেবালয়ে মহাজনেরা পৌরাণিকের মুখে পুরাণ শুনতেন। রাজাও নদীতে স্নান করে দেবালয়ে গিয়ে দেবতাকে প্রণাম করে মহাজনগণের কাছে বসলেন। সেই সময়ে পৌরাণিক পুরাণ পাঠ করতে লাগলেন।

পৌরাণিক বলতে লাগলেন, 'শরীর অনিত্য, সম্পদও নিত্য নয়; মৃত্যুও সকল সময়ে কাছেই রয়েছে। অতএব ধর্মোপার্জন করাই কর্তব্য। পরোপকারে পুণ্য, পরপীড়ন পাপের হেতু। যে ব্যক্তি দুঃখিত প্রাণীকে দেখে দুঃখিত এবং সুখীকে দেখে সুখী হয়, সেই ব্যক্তিই নৈষ্ঠিক ধর্মবেত্তা। আমি ভালো করেই জানি, যে ব্যক্তি ভয়ভীতগণকে অভয় দান করে তার সেই ধর্মের চেয়ে জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নেই। একটি ভয়ভীত লোককে অভয় দান সহকারে জীবন দান করলে যে ফল হয়, সহস্র ব্রাহ্মণকে সহস্র গোদান করলেও সে ফল পাওয়া যায় না। স্বর্ণধেনু ও পৃথিবীদাতা জগতে সহজেই পাওয়া যায়, কিন্তু সর্বজীবে অভয়দাতা দয়ালু পুরুষ পাওয়া

যায় না। যে ব্যক্তি চতুঃসাগর অবধি এই পৃথিবী দান করে এবং যে ব্যক্তি সর্বজীবে অভয়দাতা, এই দুইয়ের মধ্যে অভয়দাতাই শ্রেষ্ঠ। প্রতিক্ষণ বিনাশশীল এই অনিত্য শরীর ধারণ করে যে ব্যক্তি নিত্য ধর্মোপার্জন না করে সেই অজ্ঞান ব্যক্তি শোচনীয়। যদি পরোপকারের জন্য এই দেহ নিযুক্ত না হয় তবে মানুষ প্রত্যহ আর কী উপকার করবে? একদিকে ভূরি-দক্ষিণ সকল যজ্ঞ আর একদিকে ভয়ভীত প্রাণীদের প্রাণরক্ষা, এই দুই-ই সমান।'

এই রকম পুরাণপাঠের সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে নদী পার হতে হতে প্রখর স্রোতে তাঁদের টেনে নিয়ে যাবার সময়ে নদী থেকে হাহাকার করে মহাজনগণকে বলতে লাগলেন, 'হে মহাজনগণ! শীঘ্র আসুন– শীঘ্র আসুন। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পত্নীর সঙ্গে প্রবল নদীস্রোতে ভেসে যাচ্ছি। যে কেউ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন থাকেন, আমায় সপত্নীক জীবন দান করুন।'

জলে ভাসমান সেই ব্রাহ্মণের কাতরধ্বনি শুনে মহাজনগণ সকৌতুকে দেখতে লাগলেন, কেউই নদীতে নেমে সেই প্রবাহ থেকে তাঁকে উদ্ধারের জন্য অভয় দান করলেন না।

তখন রাজা বিক্রমাদিত্য 'ভয় নেই, ভয় নেই' বলে অভয় প্রদান করে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সপত্নীক ব্রাহ্মণকে মহাস্রোত থেকে টেনে তীরে নিয়ে এলেন। ব্রাহ্মণও সুস্থ হয়ে রাজাকে বললেন, 'হে মহাসত্ত্ব! আমার এই শরীর পূর্বে মাতাপিতা থেকে উৎপন্ন হয়েছে সত্য, কিন্তু সম্প্রতি আপনার কাছ থেকে পুনর্জন্ম লাভ করলাম। আপনি আমার প্রাণদান করে মহা উপকার করেছেন। এখন যদি আপনার কিছু প্রত্যুপকার না করি তাহলে আমার জীবনধারণ ব্যর্থ হবে। আমি দ্বাদশ বৎসর গোদাবরী নদীর জলমধ্যে থেকে মন্ত্র জপ করেছি। তাতে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়েছে তা সকলই আপনাকে দান করলাম। আরও, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রত পালন করে যে কিছু সুকৃতি অর্জন করেছি তা সবই আপনি গ্রহণ

করুন।' এই বলে সমস্ত পুণ্য রাজাকে দান ও আশীর্বাদ করে ব্রাহ্মণ সপত্নীক নিজ স্থানে চলে গেলেন।

তখন অতি ভয়ঙ্কররূপ এক ব্রহ্মরাক্ষস রাজার কাছে এলো।

রাজাও তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে মহাসত্ত্ব! তুমি কে?'

রাজা বিক্রমাদিত্য 'ভয় নেই, ভয় নেই' বলে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সপত্নীক ব্রাহ্মণকে তীরে নিয়ে এলেন।

রাক্ষস বললে, 'আমি ব্রাহ্মণ। এই নগরেই আমার বাস। আমার যা করা অনুচিত আমি সর্বদা তাই করে জীবন যাপন করতাম। নিরন্তর গুরু, সাধু, মহৎ পুরুষগণের নিন্দা করতাম। সেই পাপের ফলে ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে অত্যন্ত দুঃখে এই অশ্বত্থগাছে

দশ হাজার বৎসর বাস করছি। আজ আপনার প্রসাদে আমি উদ্ধার লাভ করবো।'

এই কথা শুনে রাজা সমস্ত পুণ্য রাক্ষসকে দান করলেন। সেও সেই পুণ্যফলে পাপমুক্ত হয়ে দিব্যরূপ ধারণ করে রাজার স্তুতিবাদ করতে করতে স্বর্গে চলে গেল। রাজা নিজ নগরে চলে গেলেন।"

পুতুল এই উপাখ্যান বর্ণনা করে রাজাকে বললেন, "রাজন্! যদি আপনাতে এই রকম পরোপকার, ধৈর্য ও ঔদার্য থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা অধোমুখে রইলেন।
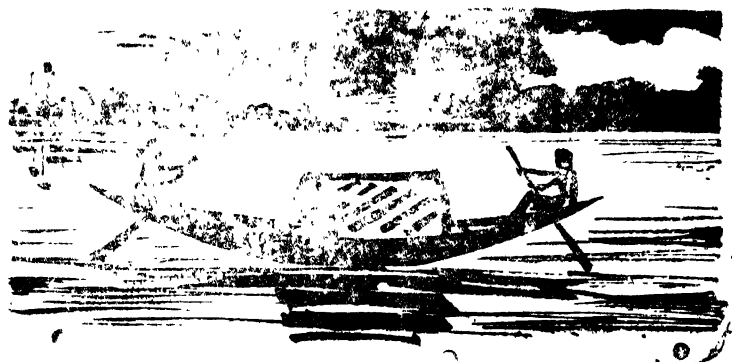
চতুর্দশ পুতুল বিদ্যাবতী

চতুর্দশ উপাখ্যান

আবার আর একটি পুতুল বললে, “রাজন্! শুনুন। রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন পৃথিবীতে কোথায় কী আশ্চর্য, কোন্ সাধু, কোন্ তীর্থ ও কোন্ দেবতা আছেন যোগিবেশে দেখে বেড়াতে বেড়াতে এক নগরে উপস্থিত হলেন।

সেই নগরের কাছে একটি তপোবন আছে। সেই তপোবনে জগদম্বার একটি বিশাল মন্দির আছে। তার কাছ দিয়ে একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। রাজাও সেই নদীতে স্নান ও দেবতাকে প্রণাম করে মন্দিরে বসে যখন চারধারে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, তখন অবধূতসার নামে এক যোগী সেখানে এলেন।

‘সুখী হলাম’ বলে যোগী রাজার সঙ্গে সেই দেবালয়ে বসলেন।

যোগী রাজাকে বললেন, ‘আপনি কোথা থেকে এসেছেন?’

রাজা বললেন, ‘আপনি পথিক, তীর্থযাত্রী।’

যোগী বললেন, ‘আপনি রাজা বিক্রমাদিত্য। উজ্জয়িনীনগরে একদিন আমি আপনাকে দেখেছি। অতএব আমি আপনাকে জানি। আপনি কিসের জন্য এখানে এসেছেন?’

রাজা বললেন, ‘যোগিরাজ! আমার মনোবাসনা এই যে, পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে কোথায় কী আশ্চর্য আছে দেখবো, তাতে সাধু দেখাও হবে।’

অবধূতসার বললেন, ‘রাজন্! আপনি এমন বিজ্ঞ হয়েও

প্রমত্ত হয়ে উঠে দেশান্তরে এসেছেন। রাজ্যে যদি বিপ্লব হয় তখন কী করবেন?'

রাজা বললেন, 'আমি মন্ত্রীর হাতে রাজ্যভার দিয়ে এসেছি।'

যোগী বললেন, 'তথাপি আপনি নীতিশাস্ত্র-বিরোধী কাজ করেছেন। শাস্ত্রে বলে, যে সকল রাজা কর্মচারীর হাতে রাজ্যভার দিয়ে শৈলবিহার করে সেই মূর্খ রাজারা বিড়ালের কাছে দুধের কলসী রেখে ঘুমিয়ে থাকে। আবার, পুরুষানুক্রমিক, রাজ্য হলেও তা উপেক্ষা করা উচিত নয়, আরও সুদৃঢ় করা কর্তব্য। কৃষিকাজ, বিদ্যা, বণিক, ভার্যা, নিজ ধন ও রাজ্যসম্পদ—কালসর্পের মুখ যেমন করে বন্ধ করা হয়, এগুলিও তেমনি সুদৃঢ় করা কর্তব্য।'

যোগীর মুখে এই কথা শুনে রাজা বললেন, 'এ সবই মিথ্যা। এখানে দৈববলই প্রবল। প্রয়োজনীয় সামগ্রীপূর্ণ রাজ্যে পৌরুষ-সম্পন্ন ব্যক্তি থাকলেও দৈব বিমুখ হলে তাঁকে পরাভব লাভ করতে হয়। শাস্ত্রেও বলে, বৃহস্পতি যাঁর নেতা, বজ্র যাঁর অস্ত্র, সুরগণ যাঁর সৈনিক, অমরপুরী যাঁর দুর্গ, হরি যাঁর প্রতি অনুগ্রহবান, ঐরাবত যাঁর বাহন, এই রকম আশ্চর্য বলের অধিকারী হয়েও ইন্দ্র শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেন। কাজেই দৈবই একমাত্র শরণ; বৃথা পুরুষকারকে ধিক্। আরও, সুন্দর আকৃতি, কুল, শীল, বিদ্যা, সযত্ন সেবা—এ সবের কিছুই সফল হয় না। রণে ইন্দ্রের ঐরাবতের দন্তকুমুদরাজি যাতে ব্যাহত হয়েছিল, পিনাকপাণির কুঠার যাতে প্রতিহত হয়, নৃসিংহদেবের নখরে সেই হিরণ্যকশিপুর বক্ষও বিদীর্ণ হয়েছিল। দৈব প্রতিকূল হলে তৃণও বজ্রের মতো কঠিন হয়। 'বটবৃক্ষস্থ যক্ষেরা যা দান করেছিল, তাই হরণ করছে। অতএব হে কল্যাণি! যা ঘটবার বা ভবিতব্য তা ঘটবেই। তুমি পাশার দান চালো।'

যোগী বললেন, 'সে কী?'

রাজা বললেন, 'উত্তরদেশে নদীপর্বতবর্ধন নামে নগর আছে।

সেখানে রাজশেখর নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি দেব-দ্বিজপরায়ণ ও ধার্মিক ছিলেন। একদিন তাঁর জ্ঞাতিগণ একসঙ্গে মিলে তাঁর সঙ্গে বিরোধ করে তাঁর রাজ্য অধিকার করে তাঁকে ও তাঁর মহিষীকে নগর থেকে বার করে দিলে। রাজা স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেশে দেশে পর্যটন করতে করতে এক নগরের উপবনে এলেন। তখন সূর্যাস্ত হলো। তিনি পত্নী ও পুত্রকে নিয়ে বটগাছের তলায় বসে থাকলেন। সেই গাছে পাঁচটি পাখি থাকতো। তারা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে লাগলো। তখন পাখিদের একটি আর একটিকে বললে, 'এই নগরের রাজা মারা গেছেন, তাঁর কোন সন্তান নেই। কে বা রাজা হবে।'

দ্বিতীয় পাখিটি বললে, 'এই বটগাছের গোড়ায় যে রাজা বসে আছে সেই রাজা হবে।'

অন্য পাখি বললে, 'তাই হোক।'

রাজা পাখিদের কথা শুনতে পেলেন।

তারপর সূর্যোদয় হলো। সকলে নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হলো। রাজাও সন্ধ্যাদি কর্ম করে সূর্যকে অর্ঘ্য দান ও নমস্কার করে যখন রাজপথের দিকে বার হলেন, তখন রাজা কে হবেন তাই স্থির করবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রীরা যে হস্তিনীকে মালা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন সে সেখানে উপস্থিত হলো। সে রাজাকে দেখামাত্র তাঁর গলায় মালা দিয়ে নিজের পিঠে চড়িয়ে রাজপুরীতে নিয়ে গেল। তখন সমস্ত মন্ত্রী মিলে তাঁর অভিষেক করে তাঁকে সিংহাসনে বসালেন।

তারপর একদিন বিপক্ষ নৃপতিগণ সন্ধিবদ্ধ হয়ে রাজশেখরকে উৎখাত করতে সেই নগরে উপস্থিত হলেন। তখন রাজা রানীর সঙ্গে পাশা খেলছিলেন। রানী বললেন, 'নাথ। আপনি কেন চুপ করে আছেন? বিপক্ষ নৃপতিরা নগর বেষ্টন করছেন। প্রভাতে নগরসমেত আমাদেরও গ্রহণ করবে।'

রাজা বললেন, 'যত্নে কী ফল? যদি দৈব অনুকূল হন তবে সকল কাজ আপনি হবে। যদি দৈব প্রতিকূল হন তবে সবই আপনি বিনষ্ট হয়। এ কথা কী তুমি বুঝতে পার না? দৈবই ক্ষয়-বৃদ্ধির কারণ। আরও দেখ, যে সময়ে গাছতলায় ছিলাম, তখন তিনি
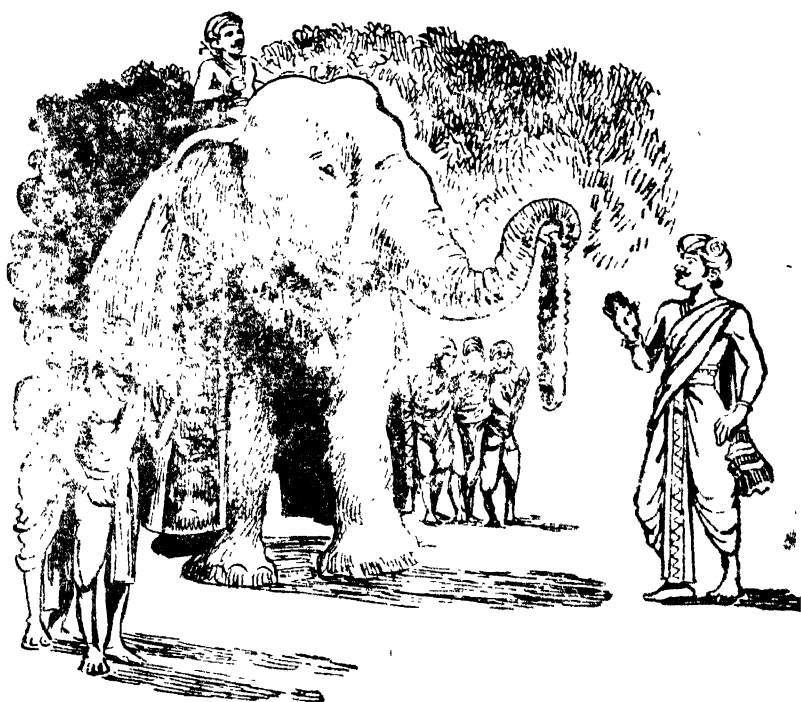
রাজাকে দেখামাত্র তাঁর গলায় মালা দিয়ে নিজের পিঠে চড়িয়ে রাজপুরীতে নিয়ে গেল।

আমাকে রাজ্য দান করেছেন। সকল বিষয়ের চিন্তার ভার তাঁর। আমার ওপর যা পড়েছে সে সম্বন্ধে চিন্তা তিনি করবেন, আমার চিন্তাও তাঁকে করতে হবে।'

দৈবের প্রাধান্য সম্বন্ধে নানা কথা বলার পরে রাজা মহিষীকে বললেন, 'হে কল্যাণি! সব সময়ে দৈববলই প্রবল। যা ঘটবার ঘটবেই। কাজেই তুমি পাশার দান চালো।'

তাঁর সেই কথা শুনে যিনি রাজাকে রাজ্য দান করেছেন তিনি চিন্তিত হলেন—আমি এই রাজাকে রাজ্যভার দান করেছি; যদি আমি এখন যত্নবান না হই তাহলে মহা অনিষ্ট ঘটবে। এই বিচার করে সেই দেবতা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে শত্রুগণকে তর্জন করতে লাগলেন। তাঁরা সকলে পরাজিত হলেন। তাতে রাজা রাজশেখর নিষ্কণ্টক হয়ে রাজ্য করতে লাগলেন।'

বিক্রমাদিত্য এই কাহিনী বললেন। তখন যোগীন্দ্র এই কাহিনী শুনে অতি সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে একটি কাশ্মীরলিঙ্গ দান করে বললেন, 'রাজন্! এই কাশ্মীরলিঙ্গ চিন্তামণির মতো। এ চিন্তিত বস্তু দান করে। সম্যক্ ভাবে এই লিঙ্গের পূজা করবেন।'

রাজা 'তথাস্তু' বলে যেমনি রাজপথে এলেন অমনি এক ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে এসে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'রাজন্! শিবলিঙ্গ পূজা করা আমার নিয়ম। পথে আমার শিবলিঙ্গটি বিনষ্ট হয়েছে। আমি তিনদিন উপবাসে আছি।'

রাজাও ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরলিঙ্গটি দান করে নিজ নগরে চলে গেলেন।"

পুতুল এই উপাখ্যান বর্ণনা করে ভোজরাজকে বললে, "রাজন্! আপনাতে যদি এই রকম ঔদার্যাদি গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ মৌন রইলেন।

পঞ্চদশ পুতুল
নিরুপমা

পঞ্চদশ উপাখ্যান

আবার আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্‌। শুনুন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বসুমিত্র ছিলেন তাঁর পুরোহিত। বসুমিত্র ছিলেন অত্যন্ত রূপবান, সকল কলাবিদ্যায় অভিজ্ঞ, রাজার অত্যন্ত প্রিয়, পরোপকারী ও মহাধনী।

একদিন তিনি মনে মনে বিচার করলেন, গঙ্গাস্নান ভিন্ন অন্য কিছুতেই উপার্জিত পাপ ক্ষয় হয় না। শাস্ত্রেও বলে, তীর্থস্নানের অপেক্ষা আর কিছুই নেই। তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, যজ্ঞ বা দানে সদ্গতি না হলে জাহ্নবীসেবায় সদ্গতি হয়। রবি যেমন গাঢ় অন্ধকার দূর করে উদয় হন, গঙ্গাস্নানেও তেমনি সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে লোকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। যারা জন্মান্ধ ও যারা পশুতুল্য পাপতারিণী গঙ্গাকে দর্শন করবার সামর্থ্য তাদের নেই।

বসুমিত্র মনে মনে এই কথা বিচার করে বারাণসীতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করলেন এবং প্রয়াগে গিয়ে মাঘস্নান করে নিজ নগরের দিকে চললেন। পথে একটি নগর ছিল। সেই নগরে শাপভ্রষ্টা কোন সুরবালা রাজত্ব করছিলেন। তাঁর পতি ছিল না। সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের একটি বিশাল মন্দির ছিল। তার কাছে একটি বিবাহ-মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই দেব-প্রাসাদের ফটকে প্রকাণ্ড এক লোহার কড়াইয়ে তেল তপ্ত করা হচ্ছিল। সেখানে যে সকল পুরুষ নিযুক্ত ছিল, তারা দেশান্তর থেকে যারা

আসছিল, তাদের বলছিল, যদি কোন মহা সারবান ব্যক্তি এই তপ্ত তেলের মধ্যে পড়তে পারেন তাহলে এই মন্মথ-সঞ্জীবনী নামক অপ্সরা তাঁরই গলায় মালা দান করবেন।'

বসুমিত্রও এই সব দেখে নিজ নগরে ফিরে এলেন। বন্ধুগণের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। বসুমিত্র নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছেন এজন্য সকলেই আনন্দিত হলেন। প্রভাতে তিনি রাজমন্দিরে গিয়ে রাজদর্শন করে তাঁকে গঙ্গাজল ও বিশ্বনাথের প্রসাদ দান করে বসলেন।

তারপর রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বসুমিত্র। তোমার তীর্থযাত্রা নির্বিঘ্নে হয়েছে তো?'

বসুমিত্র বললেন, 'প্রভু! আপনার প্রসাদে তীর্থযাত্রা করে নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছি।'

রাজা বললেন, 'দেশান্তরে গিয়ে অপূর্ব কী দেখেছো?'

বসুমিত্র তখন এই সুরাঙ্গনা ও তপ্ত তৈলের বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন।

তখন রাজা বসুমিত্রের সঙ্গে সেখানে গেলেন। সেখানে গিয়ে স্নান ও লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণাম করে সেই তপ্ত তৈলে পড়লেন। সেখানে যে সব লোক ছিল তারা হাহাকার করে উঠলো। তপ্ত তৈলে পড়ায় রাজশরীর মাংসপিণ্ডের মতো হয়ে গেল।

এই সংবাদ শুনে মন্মথ-সঞ্জীবনী অমৃত এনে সেই মাংসপিণ্ডের উপর ছিটিয়ে দিলেন। তাতে রাজা দিব্যরূপধর পুরুষ হয়ে উঠলেন। তখন মন্মথ-সঞ্জীবনী যেমনি রাজার গলায় মালা দিতে যাবেন অমনি রাজা বললেন, 'হে মন্মথ-সঞ্জীবনী! যদি তুমি আমার হও, তাহলে আমার কথা শোন।'

মন্মথ-সঞ্জীবনী বললেন, 'প্রভু! বলুন! আপনার আদেশ আমি অবশ্য পালন করবো।'

রাজা বললেন, 'যদি আমার কথা পালন কর, তাহলে আমার পুরোহিতকে বরণ কর।'

মন্মথ-সঞ্জীবনী 'তথাস্তু' বলে পুরোহিতের গলায় মালা দিয়ে তাঁকে বিবাহ করলেন।

রাজাও নিজ নগরে ফিরে এলেন।"

মন্মথ-সঞ্জীবনী অমৃত এনে মাংসপিণ্ডের উপর ছিটিয়ে দিলেন।

পুতুল এই উপাখ্যান বর্ণনা করে রাজাকে বললে, "রাজন্। যদি আপনাতে এই রকম ধৈর্য থাকে তাহলে ঐ সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ অধোমুখে রইলেন।

———

ষোড়
হরি-মধ্যা

ষোড়শ উপাখ্যান

আবার আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্! শুনুন। রাজা বিক্রমাদিত্য দিগ্বিজয়ে বার হয়ে পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর সকল দিক্-বিদিক্ পরিভ্রমণ করে সেই সমস্ত দিকের নৃপতিগণকে পদতলাশ্রিত করে সেই সব নৃপতি যে সব অনাস্বাদিত দ্রব্যভার তাঁকে দান করলেন সেগুলি নিয়ে আবার তাঁদের স্ব স্ব পদে স্থাপন করে নিজ নগরে ফিরে এলেন। যখন তিনি নগরে প্রবেশ করেন সেই সময় দৈবজ্ঞ বললেন, 'হে দেব! চারদিন পর্যন্ত নগরপ্রবেশের শুভ মুহূর্ত নেই।'

তার কথা শুনে রাজা নগরের বাইরেই অবস্থান করতে লাগলেন। উদ্যানে পটমণ্ডপ তৈরি করে চারদিন সেখানেই থাকলেন।

ইতিমধ্যে চারদিন পরে ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হলো। বসন্তের শোভা দেখে, মন্ত্রী সুমন্ত্রী রাজার কাছে গিয়ে বললেন, রাজন্! ঋতুরাজ বসন্ত এসেছেন, আজ বসন্ত পূজা করা কর্তব্য। তাঁর পূজা করলে সকলেই আপনার প্রতি প্রসন্ন হবে, সকলেই সুখী হবে। সকল অনিষ্টের নাশ হবে।'

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা 'তথাস্তু' বলে অঙ্গীকার করে বসন্তপূজার জন্য আদেশ দিলেন। তারপর মন্ত্রী সুমনোহর সভামণ্ডপ তৈরি করে বেদশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণকে, গীত-বাদ্যবিশারদগণকে ও

ইতরকলাকুশলা নর্তকীগণকে আহ্বান করলেন। তারপর দীন, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, কুব্জ প্রভৃতিও উপস্থিত হলো।

সেই সভামণ্ডপে নবরত্নখচিত সিংহাসন স্থাপিত হলো। লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্তিও রাখা হলো। পূজার উদ্দেশ্যে কুঙ্কুম, কর্পূর, কস্তুরী, চন্দন, অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্য এবং জাতী, যূথিকা, মল্লিকা, কুন্দ, শতপত্র, মদন, চম্পক, কেতকী প্রভৃতি আনা হলো। রাজা

গায়কগণ বসন্তকে আহ্বান করতে লাগলেন।

বিধানানুসারে নারায়ণের স্বপন ও ষোড়শোপচারে পূজা করে ব্রাহ্মণাদি কলাবিদ্যাকুশল ব্যক্তিদের বস্ত্রাদি দান করলেন। তারপর গায়কগণ বসন্তরাগে আলাপ করে বসন্তকে আহ্বান করতে লাগলেন। তখন রাজা সকলকে বীটিকা (তাম্বুল) দান করলেন।

সেই সময়ে সেখানে এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে 'পিনাকপাণির

পরিগ্রহণ সময়ে সর্পকঙ্কণভূষিতা পার্বতীর সহসা—'নমঃ শিবায়'—এই অর্ধোক্তিসম্পন্ন লজ্জাবনত মুখমণ্ডল আপনার কল্যাণদায়ী হোক।' এই বলে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বললেন, 'রাজন্, আমার বক্তব্য আছে।'

রাজা বললেন, 'বলুন।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমি নন্দিবর্ধনগরবাসী ব্রাহ্মণ। আমার আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, কন্যা ছিল না। তখন আমি ভার্যার সঙ্গে জগদম্বার সম্মুখে এই সংকল্প করি—হে অম্বিকে, যদি আমার কন্যা জন্মে, তাহলে আপনার নামে তার নাম রাখবো। কন্যার দেহের ওজনের সমান সোনা দান করবো এবং কন্যাটিকে কোন বৈদিক বরে সম্প্রদান করবো।

এখন সেই কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত। একাদশ স্থানে গুরু আছেন। আগামী বৎসরেও বিবাহ হতে পারে না। আমি সেই কন্যার দেহের ওজনের সমান সুবর্ণ দান করতে ইচ্ছা করেছি। ভূমণ্ডলে বিক্রমাদিত্য ভিন্ন আর কোন দাতা নেই এই বিবেচনা করে আপনার কাছে এসেছি।'

রাজা বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ! আপনি ভালই করেছেন। আপনার যে পরিমাণ ধনের দরকার, আপনি তা গ্রহণ করুন।'

তারপর ভাণ্ডারিককে ডেকে বললেন, 'ভাণ্ডারিক! এই ব্রাহ্মণকে এঁর কন্যার দেহের সমান ওজনের স্বর্ণ দাও। তা ছাড়াও আরও অষ্টকোটি স্বর্ণ দাও।'

রাজাজ্ঞা পেয়ে ভাণ্ডারিক ব্রাহ্মণকে সেই পরিমাণ সুবর্ণ দান করলো। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হয়ে নিজ স্থানে গমন করলেন। রাজাও শুভমুহূর্তে পুরীতে প্রবেশ করলেন।"

তারপর পুতুল বললে, "দেব! আপনাতে যদি এই রকম ঔদার্য থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ মৌন হয়ে রইলেন।

সপ্তদশ পুতুল
মদনসুন্দরী

সপ্তদশ উপাখ্যান

আবার আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্ ! শুনুন। ঔদার্যে বিক্রমাদিত্যের সমান আর কেউই ছিল না। সেই ঔদার্যগুণেই ত্রিভুবনে তাঁর কীর্তি বিস্তার লাভ করেছিল। সকল প্রার্থীই রাজার স্তুতিবাদ করতো। সর্বদা দাতাদের স্বস্তিবাচন দাতাদেরই প্রীতির কারণ হয়ে থাকে, শূরগণের নয়।

শাস্ত্রে বলে, প্রার্থিগণের স্বস্তিবাচন দাতাদের প্রীতির কারণ হয় আর প্রহারার্থ শূরগণের প্রীতির কারণ হয় রণদুন্দুভিনিনাদ।

বীর্য ধৈর্য জ্ঞানানুষ্ঠানাদি সকলের হয় বটে, কিন্তু ত্যাগগুণ হয় না। পশুগণ গুণে মুগ্ধ হয়, শুকপক্ষীরা পড়ে, কিন্তু যে ব্যক্তি দাতা, সে ব্যক্তি শূর ও পণ্ডিত বলে গণ্য। কেউ স্বভাববীর, কেউ দয়াবীর, কিন্তু কেউই দানবীরের ষোড়শাংশের একাংশেরও সমান নয়। ত্যাগই একমাত্র শ্লাঘ্য গুণ। অন্য গুণে কী ফল? ত্যাগের প্রভাবে পশু, পাষাণ ও বৃক্ষও পূজিত হয়। আমার মতে শত শত গুণের চেয়ে বদান্যতা শ্রেষ্ঠ। তার ওপর যদি বিদ্যামণ্ডিত হয় তবে আর্ কথা কী? সেই রকম ব্যক্তিতে বীরত্ব থাকলে তাকে নমস্কার করি।

এই তিনটি গুণ বিক্রমাদিত্যে বিদ্যমান ছিল। তার ওপর তাঁতে মদগর্ব ছিল না। কাজেই তাঁতে এই চারিটি গুণ ছিল।

একদিন অপর মণ্ডলের এক রাজার সম্মুখে কোন স্তুতিপাঠক

বিক্রমাদিত্যের গুণাবলী কীর্তন করছিল। তা শুনে সেই রাজার মনে স্পর্ধার সঞ্চার হলো। তিনি স্তুতিপাঠককে বললেন, 'বন্দিন্! স্তুতিপাঠকগণ সর্বদা বিক্রমাদিত্যের গুণকীর্তন করে কেন? অন্য কোন রাজা কী নেই?'

বন্দী বললে, 'রাজন্! ত্যাগে, পরোপকারে, সাহসে, শৌর্যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সমান ত্রিভুবনে কেউ নেই। পরোপকারের উদ্দেশ্যে তাঁর নিজদেহেও মমত্ব নেই।'

বন্দীর কথা শুনে 'আমিও পরোপকার করবো' মনে মনে এই রকম চিন্তা করে রাজা এক যোগীকে ডেকে বললেন, 'পরোপকারের জন্যে যাতে নূতন নূতন বস্তু পাওয়া যায়, আমার কাছে তার উপায় বলুন। আমি সেই উপায় অবলম্বন করে তা সম্পাদন করবো।'

যোগী বললেন, 'সেরূপ উপায় কিছু নেই।'

রাজা আবার বললেন, 'যদি কিছু থাকে তা বলুন, আমি সম্পাদন করবো।'

যোগী বললেন, 'কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিন চতুঃষষ্ঠী যোগিনীচক্রের পূজা করুন। তাতে মন্ত্রপাঠ করে দশাংশ হোম করতে হবে। হোমান্তে পূর্ণাহুতির জন্যে নিজ দেহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবেন। এই রকম করলেই যোগিনীচক্র প্রসন্ন হয়ে মহারাজাকে নূতন দেহ দান করে বলবেন, 'রাজন্! বর প্রার্থনা করো।' আপনি বললেন, 'হে মাতৃগণ! যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে আমার গৃহে যে সাতটি বৃহৎ কুম্ভ আছে প্রত্যহ সেগুলিকে সুবর্ণপূর্ণ করুন। যোগিনীচক্র বলবেন, 'যদি তিনমাস পর্যন্ত নিজ দেহ অগ্নিতে আহুতি দিতে পার, তাহলে আমরা তোমার প্রার্থনা পূরণ করতে পারি।'

তখন রাজা 'তথাস্তু' বলে সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে প্রত্যহ নিজ দেহ আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হলেন।

একদিন বিক্রমাদিত্য সেই কথা শুনে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং পূর্ণাহুতি দানকালে নিজ দেহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করলেন।

তখন যোগিনীচক্র পরস্পরকে বললেন, 'আজ অন্যের দেহের মাংস বলে বোধ হচ্ছে। এ আরও সুস্বাদু। এর হৃদয়ে মহাসার আছে।' এই বলে বিক্রমাদিত্যকে পুনর্জীবিত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে মহাসত্ব। তুমি কে? তোমার দেহত্যাগের প্রয়োজন কী?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আমি পরোপকারের জন্যে অগ্নিতে নিজ শরীর আহুতি দিয়েছি।'

যোগিনীগণ বললেন, 'আমরা প্রসন্ন হলাম। তুমি বর প্রার্থনা করো।'

'এই রাজা প্রত্যহ মৃত্যু থেকে মহাকষ্ট পাচ্ছেন, তা নিবারণ করুন।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তা হলে এই রাজা প্রত্যহ মৃত্যু থেকে মহাকষ্ট পাচ্ছেন, তা নিবারণ করুন। এই সাতটি মহাকুম্ভ নিত্য সুবর্ণবর্ণ হোক।

যোগিনীগণ 'তথাস্তু' বলে অঙ্গীকার করে সেই রাজার মৃত্যু নিবারণ করলেন। কুম্ভগুলি সুবর্ণে পূর্ণ হলো।

তারপর রাজা নিজ নগরে চলে গেলেন।"

এই উপাখ্যান বর্ণনা করে পুতুল ভোজরাজকে বললে, "রাজন্! আপনাতে এই রকম পরোপকার, ধৈর্য ও দয়া যদি থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ অধোবদনে রইলেন।

অষ্টাদশ পুতুল
বিলাস-রসিকা

অষ্টাদশ উপাখ্যান

পুনরায় ভোজরাজ যেমন সিংহাসনে বসতে যাবেন অমনি আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্! যদি রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো আপনাতে ঔদার্যাদি গুণ থাকে, তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা বললেন, "রাজা বিক্রমাদিত্যের কী রকম নীতি ছিল বল।"

পুতুল বললে, "রাজন্! শুনুন। মণিপুরে নীতিশাস্ত্রজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পুত্রকে তিনি যখন নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দেন তখন আমিও তা শুনেছি, তাই আপনার কাছে নিবেদন করবো।"

রাজা বললেন, "বল।"

পুতুল বললে, "রাজন্! শুনুন! বুদ্ধিমান পুরুষ দুর্জনের সংসর্গ করবে না, কেননা তাতে অনর্থপরম্পরার কারণ ঘটে। শাস্ত্রেও বলে, দুর্জনের সংসর্গ অনর্থপরম্পরার কারণ। তাতে সাধু ব্যক্তির নিন্দা হয়। লঙ্কেশ্বর দাশরথির পত্নীকে হরণ করলো, কিন্তু বাঁধা পড়লেন দক্ষিণ সাগরাধিপতি। আরও, অসতের সংসর্গ সর্বদা বিনয় ও যশ নষ্ট করে, দুর্নীতি ও অযশকে ঘনীভূত করে থাকে, নরকসঞ্চয় করে দেয়। কাজেই সাধুসংসর্গ করাই উচিত। সংসারে সাধুসংসর্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ আর নেই; কারণ, তা থেকে মহান্ আনন্দাদি গুণের উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রেও কথিত হয়, মন্দ মন্দ বায়ু, চন্দ্র ও চন্দন অপেক্ষাও স্নিগ্ধ মনোহর ভাব আনে, মন্দ ভাব দূর করে সম্পদের উৎপত্তি করে।

আরও দেখ, কারো সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত নয়। বিনা দোষে ভৃত্যদিগের দণ্ডবিধান করবে না। গুরুতর দোষ না দেখলে, স্ত্রীজাতিকে ত্যাগ করতে নেই। তাতে নরকগামী হতে হয়। শাস্ত্রে বলে, যে নারী আদেশ প্রতিপালন করে, যে সুরূপা, গৃহকাজে দক্ষা ও সচ্চরিত্রা তাকে পরিত্যাগ করলে অক্ষয় নরকবাস হয়। লক্ষ্মী অচঞ্চলা একথা ভাবা উচিত নয়; তিনি জলের মতো চঞ্চলা। শাস্ত্রে বলে, ধন বিতরণ করো, মাননীয় ব্যক্তির সম্মাননা করো, সজ্জনগণের ভজনা করো। কারণ, মহাবেগবান বায়ুদ্বারা কম্পিত দীপশিখার মতো কমলা নিরন্তর চঞ্চলা। নারীজাতির কাছে গুপ্ত কথা প্রকাশ করবে না, ভবিষ্যৎ চিন্তা করবে না, শত্রুকেও হিতকথা বলবে, দান ও অধ্যয়ন ছাড়া দিন যাপন করবে না। পিতার সেবা করবে। চোরের সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না। নিষ্ঠুর উত্তর দান করবে না। অন্নের জন্য অনেক আড়ম্বর করবে না।

শাস্ত্রে বলে, অন্নের চেয়ে বেশি রক্ষা করাই পাণ্ডিত্য; আর্তকে দান করবে, ধর্ম বিবেচনায় বাক্য, মন ও কর্মের দ্বারা পরের উপকার করবে। নীতিশাস্ত্রে লোককে এই প্রকার উপদেশ দেওয়া হয়।

সেই রাজা বিক্রমাদিত্য স্বভাবত নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন।

এইভাবে কিছুকাল গেলে একদিন কোন বিদেশী রাজাকে দর্শন করে তাঁর কাছে উপবেশন করলো।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে দেবদত্ত! তোমার নিবাস কোথায়?'

সে বললে, 'রাজন্! আমি বিদেশী, আমার বাসস্থান কোথাও নেই, আমি সর্বদা ভ্রমণ করে বেড়াই।'

রাজা বললেন, 'পৃথিবী ভ্রমণ করে তুমি অপূর্ব কি দেখেছো?'

সে বললে, 'রাজন! একটি মহা আশ্চর্য দেখেছি।'

রাজা বললেন, 'কী দেখেছো?'

বিদেশী বললে, 'উদয়াচলে সূর্যদেবের বিশাল মন্দির আছে। সেখানে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছেন। গঙ্গাতীরে পাপবিনাশন নামে একটি

মন্দির আছে। সেখানে গঙ্গাপ্রবাহ থেকে একটি সুবর্ণস্তম্ভ নির্গত হয়। সেই স্তম্ভের উপর নবরত্নখচিত একখানি সিংহাসন আছে। সূর্যোদয়ের পর থেকে সেই স্বর্ণস্তম্ভ পূর্ণ বৃদ্ধি পেতে থাকে ; মধ্যাহ্নে
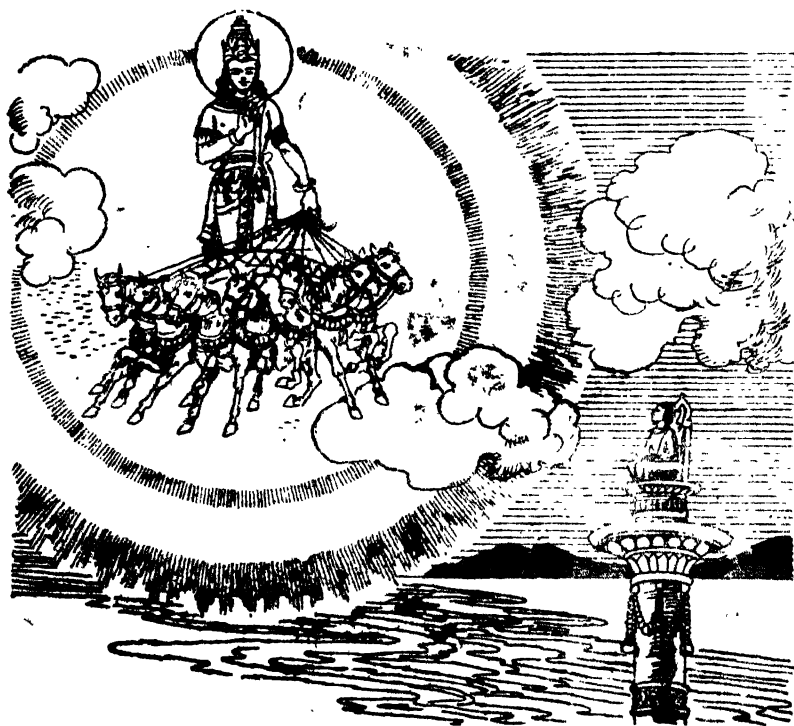
স্তম্ভ সূর্যের দিকে যেতে লাগলো

সূর্যমণ্ডল প্রাপ্ত হয়। তারপর সূর্য যখন অস্তগমন করে, তখন সেই স্বর্ণস্তম্ভ আপনিই গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হয়। প্রত্যহ সেখানে এই রকম হচ্ছে। আমি এই মহদাশ্চর্য দেখেছি।'

বিদেশীর কাছে এই কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য বিদেশীর সঙ্গে সেখানে গিয়ে রাত্রে নিদ্রিত হলেন। প্রভাতে যেমনি সূর্যোদয় হলো অমনি গঙ্গাপ্রবাহ থেকে একখানি রত্নসিংহাসনযুক্ত স্বর্ণস্তম্ভ নির্গত

হলো। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য স্বয়ং সেই সিংহাসনে বসলেন আর স্তম্ভ সূর্যের দিকে যেতে লাগলো।

যখন স্তম্ভ সূর্যের কাছে গিয়ে পৌঁছলো তখন অগ্নিকণার মতো সূর্যকিরণে রাজার শরীর মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো। সেই পিণ্ডের আকারেই তিনি সূর্যমণ্ডলে উপস্থিত হলেন। সূর্যকে এই বলে নমস্কার করলেন—

'জগতের সবিতা, জগতের একমাত্র চক্ষুস্বরূপ, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের হেতু, ত্রয়ীময়, ত্রিগুণাত্মক, ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবরূপী সূর্যকে নমস্কার।'

তখন সূর্য সেই স্তম্ভে অমৃত ছিটিয়ে দিলেন। রাজার দিব্য শরীর হলো।

সূর্য বললেন, 'রাজন্! তুমি মহাসারবানেরও অধিক। এই সূর্যমণ্ডল সকলের অগম্য, তুমি এখানেও এসেছ। অতএব আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, বর প্রার্থনা করো।'

রাজা বললেন, 'মুনিগণও যেখানে আসতে পারেন না, আমি সেখানে এসেছি। এর চেয়ে আর কী শ্রেষ্ঠ? আপনার প্রসাদে আমার সকল রকমের অর্থ আছে।'

রাজার এই কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে সূর্যদেব নিজের নবরত্নখচিত কুণ্ডল দুটি রাজাকে দান করে বললেন, 'রাজন্! এই কুণ্ডল দুটি প্রত্যহ একভার সুবর্ণ দান করে।'

রাজা কুণ্ডল দুটি নিয়ে সূর্যদেবকে প্রণাম করে সেখান থেকে নেমে উজ্জয়িনীর দিকে যেতে লাগলেন, অমনি পথে এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, 'মহেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।' তারপর ব্রাহ্মণ বললেন, 'হে যাজ্ঞিক। আমি কুটুম্বী ব্রাহ্মণ, কিন্তু দরিদ্র। ভিক্ষা করে বেড়াই, তাতে উদর পূর্ণ হয় না।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শুনে সেই ব্রাহ্মণকে কুণ্ডল দুটি দান

করে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ! এই কুণ্ডল দুটি তোমাকে প্রত্যহ এক একভার স্বর্ণ দান করবে।'

এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হয়ে রাজার স্তুতিবাদ করে নিজ স্থানে চলে গেলেন। রাজাও উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন।"

পুতুল এই উপাখ্যান কীর্তন করে বললে, "রাজন্! যদি আপনাতে এই রকম ঔদার্য ও ধৈর্য থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা মৌন হয়ে রইলেন।

উনবিংশ পুতুল
শৃঙ্গার-কলিকা

উনবিংশ উপাখ্যান

রাজা পুনরায় সিংহাসনে বসবার উপক্রম করতেই আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্! আপনাতে যদি বিক্রমাদিত্যের মতো ঔদার্যাদি গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা বললেন, "সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যগুণের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।"

পুতুল বললে, "রাজন্! শুনুন। বিক্রমাদিত্য যখন এই বিশাল ভূমণ্ডল শাসন করেন, তখন সকল লোকই আনন্দে পূর্ণ ছিল। ব্রাহ্মণগণ ষট্‌কর্মনিরত, স্ত্রীলোকেরা প্রতিব্রতা, মানুষেরা শতবর্ষজীবী, বৃক্ষসকল সদা ফলবান, মেঘ যথাকালবর্ষী এবং ধরণী সর্বদা শস্যবতী ছিল। লোকে পাপকে ভয় করতো, অতিথির পূজা করতো, জীবে দয়া ছিল। লোকে গুরুসেবা ও সর্বদা দান করতো এবং প্রজাগণ সদ্‌বৃত্তিশীল ছিল।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে উপবেশন করলে সেই সভায় নানা মণ্ডলের রাজকুমারগণও আসন গ্রহণ করলেন। তাঁরা কেউ কেউ নিজেদের বংশাবলীর স্তুতিবাদ পাঠ করতে লাগলেন, কোন কোন উদ্ধতচরিত্র রাজপুত্র নিজ নিজ বাহুবলের প্রশংসা করতে লাগলেন, কোন কোন রাজপুত্র নিজ নিজ শক্তিমত্তাগর্বে পরস্পরকে উপহাস করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শরণাগত ব্যক্তিকে পালনে প্রবণ, কেউ কেউ পারলৌকিক সাধনে অনুরক্ত, কেউ কেউ ধর্ম উপার্জনে যত্নশীল।

এইভাবে সকলে বসে আছেন এমন সময়ে এক মৃগয়াকারী এসে রাজাকে নমস্কার করে বললে, 'দেব! বনে এক মহাকায় বরাহ এসেছে। তার আকার অঞ্জন পর্বতের মতো। আপনি সেখানে গিয়ে দেখুন।'

এই কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য কুমারগণের সঙ্গে বনে গিয়ে দেখলেন, নদীতীরে নিকুঞ্জবনে সেই বরাহটি রয়েছে। বীরগণের কোলাহল শুনে সেই বরাহ নিকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এলো। তখন

বরাহ সকল অস্ত্রাঘাত অগ্রাহ্য করে পর্বতগহ্বরে প্রবেশ করলো।

রাজা বিক্রমাদিত্য রাজপুত্রগণের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজ ষড়বিংশতি প্রকার অস্ত্র-সাহায্যে হস্তকৌশল প্রদর্শন করে বরাহকে আঘাত করলেন। কিন্তু বরাহ সেই সকল অস্ত্রাঘাত অগ্রাহ্য করে পর্বতগহ্বরে প্রবেশ করলো। রাজাও তার পিছন পিছন পর্বতকন্দরে প্রবেশ

করলেন। সেখানে সোনার দরজা দেখে তার মধ্যে ঢুকলেন। দেখলেন, গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কিছুদূর গেলে এক জ্যোতির্ময় স্থান দেখতে পেলেন। আরও কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, সোনার প্রাচীরে ঘেরা আকাশচুম্বী শ্বেতপ্রাসাদে ভরা একটি নগর। নানা দেবমন্দির ও উপবনে নগরটি সুশোভিত। বিলাসী নরনারী থাকায় নগরটি সুন্দর শোভা ধারণ করেছে। সেখানে গিয়ে রাজা যখন একটি দোকানে ঢুকছেন তখন খুব সুন্দর একটি রাজভবন দেখতে পেলেন। সেখানে বিরোচন-পুত্র বলি রাজত্ব করছেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য রাজভবনে প্রবেশ করামাত্র বলিরাজ তৎক্ষণাৎ এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং সুন্দর সিংহাসনে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভো! আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আপনাকে দেখতে এসেছি।'

বলি বললেন, 'আজ আমার বংশ পবিত্র ও সফল হলো। বহু পুণ্যফলে আমার বাড়িতে আপনি এসেছেন।...আপনার আসার কারণ কি?'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'হে দানবরাজ! আপনাকে দেখতেই আমি এসেছি। অন্য কারণ কিছুই নেই।'

বলি বললেন, 'যদি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য আপনি এসে থাকেন, তবে দয়া করে কোন জিনিস প্রার্থনা করুন।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আমার কোন দ্রব্যেরই অভাব নেই। আপনার প্রসাদে সকল দ্রব্যেই আমার গৃহ পরিপূর্ণ।'

বলি বললেন, 'প্রভো! আপনার কোন দ্রব্যের অভাব আছে এ কথা আমি বলছি না। বন্ধুত্বের জন্যই আপনাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করি। কারণ, পণ্ডিতগণ একেই বন্ধুত্বের লক্ষণ বলেন। শাস্ত্রেও বলে, দান, প্রতিগ্রহ, গুপ্তকথা প্রকাশ, জিজ্ঞাসা, আহার ও আহরীয় দান, এই ছয়টিই সখ্যের লক্ষণ। উপকার ভিন্ন কখনো কারো সঙ্গে সখ্য হয় না। উপযাচক হয়ে দান করলে দেবগণও অভীষ্ট দান

করেন। শাস্ত্রে আরও বলে, সর্বদা দান করলে বিবেকহীন পশুরাও পুত্রের চেয়ে প্রিয়তম হয়, খল ব্যক্তিকে দান করলেও তা ব্যর্থ হয় না। দেখ, বৎসহীন মহিষীও প্রত্যহ দুগ্ধ দান করে থাকে।'

বলিরাজা বিক্রমাদিত্যকে এই কথা বলে রস ও রসায়ন দান করলেন।

তারপর রাজা বিক্রমাদিত্য বলিরাজের অনুমতি নিয়ে গহ্বর থেকে বার হয়ে গেলেন। তিনি অশ্বে আরোহণ করে রাজপথে এসেছেন অমনি এক ব্রাহ্মণ সপুত্র এসে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, 'দামোদর আপনাকে রক্ষা করুন।' তারপর বললেন, 'হে যজমান! আমি অত্যন্ত দরিদ্র ও পীড়িত ব্রাহ্মণ। আমার অনেক কুটুম্ব। যাতে সকুটুম্ব যথেষ্ট খাদ্য পেতে পারি আপনি সেই রকম ধন আমাকে দান করুন। আমরা দারুণ ক্ষুধায় পীড়িত।'

রাজা বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ! আমার হাতে এখন কিছুমাত্র অর্থ নেই। কেবল এই রস ও রসায়ন দ্রব্য দুটি আছে। এই রসের সংযোগে সপ্তধাতু সোনা হয় আর যে এই রসায়ন সেবন করে সে জরামৃত্যুহীন হয়। এ দুটির মধ্যে একটি গ্রহণ কর।'

তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, 'যে রসায়ন সেবনে জরামৃত্যুহীন হওয়া যায়, তাই দান করুন।'

বৃদ্ধের পুত্র বললেন, 'রসায়নে কি দরকার? জরামৃত্যুহীন হলেও আবার দারিদ্র্য ভোগ করতে হবে। যে রস সংযোগে অন্যান্য ধাতু সোনা হয় তাই নেওয়া উচিত।'

এইভাবে পিতাপুত্রে বিবাদ উপস্থিত হলো। রাজা বিক্রমাদিত্য উভয়ের বিবাদ শুনে রস ও রসায়ন তাঁদের দান করলেন। তাতে ব্রাহ্মণ রাজার স্তুতি করে নিজগৃহে চলে গেলেন। রাজাও স্বনগরে যাত্রা করলেন।"

এই কাহিনীটি বলে পুতুল বললে, "রাজন্! আপনাতে যদি এইরূপ ধৈর্য ও ঔদার্য থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ মৌন রইলেন।

বিংশ পুতুল
মন্মথ-সঞ্জীবনী

বিংশ উপাখ্যান

রাজা আবার সিংহাসনে উপবেশন করতে গেলে অন্য পুতুল বললে, "রাজন্! আপনাতে যদি রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো ঔদার্যাদি গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা বললেন, "সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যবৃত্তান্ত বর্ণনা কর।"

পুতুল বললে, "রাজন্! শুনুন। বিক্রমাদিত্য ছয়মাস রাজ্যশাসন ও ছয়মাস দেশপর্যটন করতেন।

একদিন তিনি দেশপর্যটনে যাত্রা করে নানা দেশ ঘুরে পদ্মালয় নামে নগরে উপস্থিত হলেন। সেই নগরের বাইরের উদ্যানে অতিনির্মল-জলভরা একটি সরোবর দেখে তার জল পান করে সেখানে বসলেন। তারপর অন্যান্য বিদেশী এসে সেই জল পান করে ও সেখানে বসে পরস্পর কথোপকথনে প্রবৃত্ত হলো।

তারা বললে, 'আমরা অনেক দেশ, বহু তীর্থস্থান দেখলাম, অতি দুর্গম পর্বতেও উঠেছি, কিন্তু কোথাও একটি মহাপুরুষও চোখে পড়লো না।'

এই কথা শুনে অন্য একজন বললে, 'মহাপুরুষ দর্শন হবে কি করে? যেখানে মহাসিদ্ধ পুরুষ থাকেন সেখানে যাওয়া অসম্ভব। কারণ, পথ অতি দুর্গম, পথে অনেক বিঘ্ন ঘটাও সম্ভব, প্রাণও বিনষ্ট হতে পারে। যে উদ্যমে প্রথমে আত্মবিনাশ সম্ভব, তার ফল কে

অনুভব করবে? সেই কারণে আগে আত্মাকে রক্ষা করাই কর্তব্য। শাস্ত্রেও বলে, ধন, স্ত্রী, ভূমি, শুভাশুভ কর্ম একবার নষ্ট হলে আবার পাওয়া যায়, কিন্তু শরীর নষ্ট হলে আর তা পাওয়ার আশা নেই। অতএব বুদ্ধিমান লোকের অকার্য করা উচিত নয়। শাস্ত্রেও বলে, ব্যসন দুরন্ত, সম্যক্‌ভাবে ব্যয় না করলে সেই ব্যসনরূপ দুষ্কর্ম সিদ্ধ হয় না; সুতরাং অসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।...আরও দেখ, পর্বতপ্রদেশ বিষম ও ঘোর, সেখানে বহু হিংস্র জন্তুর বাস, সুতরাং সে রকম সংকটে আরোহণ করা বুদ্ধিমান লোকের উচিত নয়।'

রাজা বিক্রমাদিত্য সে কথা শুনে বললেন, 'হে বিদেশি! এমন কথা কেন বলছেন? মানুষ যদি পৌরুষ ও সাহসের সঙ্গে কাজ করে, কোন কাজই দুঃসাধ্য হয় না। শাস্ত্রেও বলে, মানুষ সাহস করলে বাঞ্ছিত সামগ্রীও লাভ করতে পারে। কিন্তু যারা সন্দিগ্ধচিত্ত ও অলস তাদের তা লাভ হয় না। আরও দেখ, আকাশ থেকে কদাচিৎ জল আসে, কিন্তু পাতালগর্ভ থেকে জল পাওয়া যায়। দৈব অচিন্তনীয় ও বলবৎ। বলবানেরাই সাহসী হয়। বিনা ক্লেশে সুখ লাভ হয় না। নারায়ণ সমুদ্রমন্থনের কষ্ট সহ্য করেছিলেন বলেই লক্ষ্মীকে লাভ করেছেন। আলস্য করা অনুচিত। যতদিন মানুষ পৌরুষ প্রকাশ না করে ততদিন সৌভাগ্য লাভ কঠিন।...

এই কথা শুনে বিদেশী বললে, 'হে মহান্! আপনি এখন কি করবেন?'

রাজা বললেন, 'এখান থেকে দ্বাদশ যোজন পথ গেলে মহারণ্য-মধ্যে একটি বিষম পর্বত দেখা যায়। সেখানে ত্রিকালনাথ নামে এক যোগীশ্বর আছেন। তাঁকে দেখলে সকল রকম অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আমি সেখানে যাবো।'

বিদেশীরা বললে, 'আমরাও যাব।'

রাজা বললেন, 'স্বচ্ছন্দে এস।'

তারপর সকলে রাজার সঙ্গে সেখান থেকে বার হয়ে যেতে যেতে

দুর্গম মহারণ্যপথ দেখে রাজাকে বললে, 'হে মহাসত্ত্ব! সে পর্বত কত দূর?'

রাজা বললেন, 'সে পথ এখান থেকে আট যোজন দূরে। যদিও কিছু দূর, পথও দুর্গম, তবুও আমরা সেখানে যাবো।'

এই কথা বলে সকলে ছয় যোজন পথ অতিক্রম করবার পর দেখলো, অতি ভয়ঙ্কর একটি সাপ পথ রোধ করে রয়েছে। তার মুখ মহাকালের মুখের মতো। সেই মুখ থেকে বিষাগ্নি বার হচ্ছে।

রাজা বললেন, 'প্রভো! আমি আপনাকে দেখবার জন্য এসেছি।'

সেই সাপ দেখে সকলে ভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু রাজা বিক্রমাদিত্য সেই পথেই চলতে লাগলেন। তখন সাপ এসে রাজাকে বেষ্টন করে তাঁকে দংশন করলো। রাজা তাঁর বিষদগ্ধ দেহ কাপড়ে ঢেকে সেই

দুর্গম পর্বতে আরোহণ করলেন এবং ত্রিকালনাথ যোগীকে দর্শন ও নমস্কার করলেন। যোগীকে দেখামাত্র সাপ তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেল। রাজাও বিষমুক্ত হলেন।

তখন যোগী জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে মহাসত্ত্ব! এই স্থান মানুষের অগম্য ও বিপদসঙ্কুল। তুমি এত কষ্ট করে এখানে এসেছ কেন?'

রাজা বললেন, 'প্রভো! আমি আপনাকে দেখবার জন্য এসেছি।'

যোগী বললেন, 'নিশ্চয় তোমার অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে।'

রাজা বললেন, 'কষ্ট স্বীকার করে এসে আজ আমি ধন্য হলাম। কারণ মহদ্ব্যক্তির দর্শন লাভ অত্যন্ত দুর্লভ। যতক্ষণ শরীর সুদৃঢ় ও ইন্দ্রিয় সকল সবল থাকে ততক্ষণ হিতসাধন করাই মানুষের কাজ।...যখন গৃহে আগুন লাগে তখন কূপ খননের চেষ্টায় কি ফল?'

তখন যোগী রাজাকে একটি ঘুটিকা, একটি যোগদণ্ড ও একখানি কাঁথা দিয়ে বললেন, 'রাজন্! এই ঘুটিকা দিয়ে মাটিতে যে কয়টি দাগ কাটবেন, একদিনে তত যোজন পথ পার হতে পারবেন। এই যোগদণ্ডটি ডান হাতে নিয়ে মৃত সৈন্যের গায়ে স্পর্শ করলেই সে বেঁচে উঠবে আর যদি বাঁ হাতে নিয়ে স্পর্শ করেন তাহলে বিপক্ষের সকল সৈন্য ধ্বংস হবে। আর এই কাঁথাখানি ঈপ্সিত সকল জিনিস দান করতে পারে।'

রাজা বিক্রমাদিত্য সেই তিনটি দ্রব্য নিয়ে যোগীকে প্রণাম করে চলে গেলেন। যেতে যেতে পথে দেখলেন, এক রাজপুত্র সামনে আগুন জ্বেলে কাঠ সংগ্রহ করছে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সৌম্য! এ কি করছো?'

রাজপুত্র বললেন, 'আমি কোন রাজপুত্র। জ্ঞাতিরা আমার রাজ্য হরণ করেছে। আমি গরিব হয়ে বেঁচে থাকতে অক্ষম। তাই আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্য কাঠ সংগ্রহ করছি।'

তখন রাজা তাঁকে অভয় দিয়ে সেই ঘুটিকা, যোগদণ্ড ও কাঁথাখানি দান করলেন। জিনিস তিনটির গুণও বলে দিলেন। তখন রাজকুমার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে প্রণাম করে স্বদেশে চলে গেলেন।"

এই কাহিনী বর্ণনা করে পুতুল ভোজরাজকে বললে, "রাজন্! যদি আপনার এই রকম উদারতা থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা মৌনভাবে রইলেন।

একবিংশ পুতুল
রতি-লীলা

একবিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসবার উপক্রম করতেই আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্! রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো যাঁর ঔদার্যগুণ আছে তিনিই এই সিংহাসনে বসবার যোগ্য।"

রাজা বললেন, "তবে বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যবৃত্তান্ত বর্ণনা কর।"

পুতুল বললে, "রাজন্! শুনুন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্যশাসন করেন তখন তাঁর বুদ্ধিসিন্ধু নামে এক মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রীর পুত্রের নাম অনর্গল। অনর্গল ঘৃতান্ন আহার করে বাল্যক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকতো; কিছুমাত্র লেখাপড়া করতো না। একদিন তার পিতা তাকে বললেন, 'তুমি আমার সন্তান হয়ে অত্যন্ত দুষ্ট হয়েছো, পড়াশুনা কর না, হৃদয়শূন্য মূর্খের মতো জীবন যাপন করছো। যার হৃদয় শূন্য, সেই মূর্খ। শাস্ত্রেও বলে, যার পুত্র নেই তার গৃহ শূন্য; যে দেশে বন্ধু নেই, সে দেশ শূন্য; মূর্খের হৃদয় শূন্য এবং দারিদ্র্য সর্বশূন্য বলে কথিত। তোমাকে দিয়ে আমার কোন কাজই হবে না। যে পুত্র বিদ্বান্ বা ধর্মশীল না হয়, সে পুত্রে কি দরকার? যে গাভী গর্ভিণী না হয় বা দুধ না দেয় তাতে দরকার কী? আরও দেখ, অজাত, মৃত ও মূর্খ এই তিনের মধ্যে অজাত ও মৃত এই দুটি বরং শ্রেয়ঃ। ঐ দুটি স্বল্প দুঃখের কারণ। মূর্খ

পুত্র আজীবন দগ্ধ করে। বংশাগ্রে ধ্বজের মতো যে পুত্রের দ্বারা কুলের শোভা না হয়, মাতার যৌবনহারী সে পুত্রে কি ফল?'

পিতার মুখে এই কথা শুনে অনর্গল অনুতাপে দগ্ধ হলো। তার মনে বৈরাগ্য দেখা দিল। সে দেশান্তরে চলে গেল। তারপর এক দেশে কোন উপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে সেখানে সমস্ত নীতিশাস্ত্র পাঠ করে স্বদেশের উদ্দেশে যাত্রা করলে পথের মধ্যে এক বনে

আটজন দিব্য নারী উঠে দেবালয়ে গিয়ে দেবতার অভিষেক···করতে লাগলেন

একটি দেবালয় দেখতে পেলো। সেই দেবালয়ের কাছে একটি সরোবর। তার নির্মল জলে পদ্ম ফুটে আছে ও তার তীরে চখাচখী চরে বেড়াচ্ছে। সেই সরোবরের এক অংশের জল অত্যন্ত উষ্ণ।

অনর্গল সেখানে বসে এই সব দেখছে। এদিকে সূর্য অস্ত গেল। তারপর রাত্রে সেই জলের মাঝ থেকে আটজন দিব্য নারী উঠে দেবালয়ে গিয়ে দেবতার অভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজা করে নৃত্য-গীতে দেবতার সন্তোষ বিধান করতে লাগলেন। তাতে দেবতা প্রসন্ন হয়ে তাঁদের প্রসাদ দান করলেন।

অনর্গল এই সমস্ত ব্যাপার দেখতে লাগলো। প্রভাত হলে চলে যাবার সময়ে সেই দিব্যাঙ্গনারা অনর্গলকে দেখতে পেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন অনর্গলকে বললেন, 'হে সৌম্য! এস, আমাদের নগরে চলো।' এই বলে তাঁরা জলের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

অনর্গলেরও তাঁদের সঙ্গে যাবার ইচ্ছা হলো, কিন্তু সেই উষ্ণ জলের মধ্যে তাঁদের প্রবেশ করতে দেখে, সে ভয়ে প্রবেশ করতে পারলো না।

তারপর অনর্গল নিজ নগরে ফিরে এসে পিতা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধুজনকে দর্শন করলো। তাঁদেরও খুব আনন্দ হলো। দ্বিতীয় দিনে অনর্গল রাজাকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে রাজসভায় উপস্থিত হয়ে রাজাকে প্রণাম করে আসন গ্রহণ করলো।

রাজা পরম সমাদরে তার কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন, 'অনর্গল! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?'

অনর্গল বললে, 'বেদাভ্যাস করতে অন্য দেশে গিয়েছিলাম।'

রাজা বললেন, 'অন্য দেশে গিয়ে সেখানে আশ্চর্য কিছু দেখেছো কি?'

অনর্গল উষ্ণ জলের বৃত্তান্ত বর্ণনা করলো।

সেই কথা শুনে বিক্রমাদিত্য তার সঙ্গে সেখানে গেলেন। তখন সূর্য অস্ত গেল।

মধ্যরাত্রে সেই দিব্যাঙ্গনাগণ এসে ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা ও নৃত্যগীতে তাঁর উপাসনা করে প্রভাতে চলে যাবার উদ্যোগ করতে

তাঁদের মধ্যে একজন রাজাকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'ভদ্র! আমাদের সঙ্গে চলুন।'

এই কথা শুনে রাজা তাঁদের অনুসরণ করলেন। দিব্যাঙ্গনাগণ উষ্ণ জলের মধ্যে প্রবেশ করে সপ্তপাতালে নিজ নগরে উপস্থিত হলেন। রাজাও তাঁদের সঙ্গে সেখানে এলেন। তাঁরপর তাঁরা রাজার নীরজনাদি সৎকার করে বললেন, 'হে মহাসত্ত্ব! আপনার মতো শৌর্যাদিগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি আর কেউ নেই। অতএব আপনি এই রাজ্যের অধিপতি হোন। আমরা সমস্ত নারী আপনার সেবা করবো।'

রাজা বললেন, 'এ রাজ্যে আমার দরকার নেই! আমি কেবল কৌতূহলবশেই এখানে এসেছি। আমারও রাজ্য আছে।'

দিব্যাঙ্গনাগণ বললেন, 'হে মহাপুরুষ! আমরা আপনার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। আপনি বর গ্রহণ করুন।'

রাজা বললেন, 'আপনারা কে?'

তাঁরা বললেন, 'আমরা অষ্টমহাসিদ্ধি।'

রাজা বললেন, 'তবে আমাকে অষ্টমহাসিদ্ধি প্রদান করুন।'

তখন দিব্যাঙ্গনারা রাজাকে অষ্টগুণযুক্ত রত্ন দান করলেন। রাজা সেই রত্নগুলি নিয়ে যখন যাচ্ছেন, তখন পথে এক ব্রাহ্মণ রাজাকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন, 'চতুরানন সর্বদা আপনাদের রক্ষা করুন।'

তখন রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ব্রাহ্মণ! আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমি চম্পাপুরনিবাসী ব্রাহ্মণ। আমার অনেকগুলি পরিবার। কিন্তু আমি অতি দরিদ্র। স্ত্রী তিরস্কার করাতে আমি বিদেশে এসেছি। হে রাজন্! লোকে বলে এবং শাস্ত্রেও দেখা যায়, নির্ধন হলে স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই তাকে পরিত্যাগ করে। শাস্ত্রে আরও বলে, গৃহস্বামী নির্ধন হয়ে গৃহে থাকলে

সদ্বান্ধবেরাও তাকে নানা কথা বলে। সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি নির্ধন হয়, তা হলে প্রতিভাবান লোকেরাও তাকে পরিত্যাগ করেন। নির্ধনের আপদ ক্রমে বৃদ্ধি পায়। পত্নী সদ্বংশের কন্যা হলেও নির্ধন পতিকে ভজনা করে না। ন্যায়পরায়ণ বিক্রমশালী ব্যক্তি নির্ধন হলে মিত্রগণ তাঁর কাছে যান না। শাস্ত্রে আরও লেখা আছে—গুরুই হোন, সুশ্রীই হোন, সচ্চরিত্রই হোন বা শাস্ত্রবিশারদই হোন, নির্ধন হলে তিনি সমাজে আদর ও সম্মান লাভ করেন না।'

রাজা ব্রাহ্মণের এই কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আটটি রত্নই দান করলেন। ব্রাহ্মণও রাজার গুণগান করে স্বস্থানে চলে গেলেন। রাজাও অনর্গলের সঙ্গে উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন।"

পুতুল এই কাহিনী বর্ণনা করে ভোজরাজকে বললে, "রাজন্! যদি আপনার সেই রকম ধৈর্য ও শৌর্যাদি গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

এই কথা শুনে ভোজরাজ মৌন রইলেন।

দ্বাবিংশ পুতুল
মদনবতী

দ্বাবিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসবার উপক্রম করতেই আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্! যাঁর বিক্রমাদিত্যের মতো ঔদার্যগুণ আছে তিনিই এই সিংহাসনে বসবার যোগ্য।"

রাজা বললেন, "সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যগুণ বর্ণনা কর।"

পুতুল বললে, "হে রাজন্! শুনুন। রাজা বিক্রমাদিত্য রাজ্য পালন করতে করতে কোন সময়ে পৃথিবী পর্যটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তিনি নানান্ রকমের তীর্থ, দেবালয়, পুর, পর্বত প্রভৃতি দর্শন করে একদিন একস্থানে উপস্থিত হলেন। সেখানে আকাশস্পর্শী স্বর্ণপ্রাচীর এবং বহু শিবালয় ও হরিমন্দির শোভিত এক নগর দেখতে পেলেন। সেই নগরের বাইরে একটি হরিমন্দিরে গিয়ে সেখানকার সরোবরে স্নান ও শ্রীহরিকে নমস্কার করে স্তব করতে লাগলেন, 'হে নাথ! আমি আপনার পরম মাহাত্ম্য কিছুই জানি না। বাক্যের অগোচর শ্রীহরিকে ব্রহ্মাও জানতে পারেন না। আমি আর কাকেও ভজনা করি না, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করি না, অন্যের নাম শ্রবণ করি না, অন্য কিছু অধ্যয়ন বা চিন্তাও করি না। হে পুরুষোত্তম শ্রীনিবাস, আপনি আমাকে আপনার চরণপদ্মের দাসত্ব দান করুন।'

এইভাবে স্তব করে রাজা রঙ্গমণ্ডপে বসে এক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ব্রাহ্মণ। আমি এ কোথায় এসেছি?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমি এক তীর্থযাত্রী, পৃথিবী ভ্রমণ করছি। আপনি কোথা থেকে এসেছেন?'

রাজা বললেন, 'আমিও আপনার মতো একজন তীর্থযাত্রী।'

ব্রাহ্মণ রাজাকে ভাল করে দেখে বললেন, 'না, আপনাকে মহা তেজস্বী দেখাচ্ছে। আপনাতে সমস্ত রাজলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি রাজসিংহাসনে বসবার যোগ্য। আপনি পৃথিবী ভ্রমণ করছেন কেন? অথবা ললাটের লিখন কেউই খণ্ডাতে পারে না। শাস্ত্রেও বলে, কি হরি, কি হর, কি ব্রহ্মা, কি দেবগণ কেউই ললাটলিখন খণ্ডাতে পারেন না।'

রাজা নিজ পরিচয় দিয়ে ব্রাহ্মণের কথা সমর্থন করলেন। কারণ কথাগুলি যুক্তিযুক্ত।

যে কথা যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় তা বালকের কাছ থেকেও গ্রহণ করা যায়। কিন্তু যুক্তিবিরুদ্ধ দুর্বচন বৃদ্ধের কাছ থেকেও গ্রহণ করবে না।

রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, 'আপনাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখছি কেন?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমার শ্রমের কারণ আর কি বলবো?'

রাজা বললেন, 'আপনার কষ্টের কারণ বলুন।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'হে রাজন্! শুনুন। এই স্থানের অনতিদূরে নীল নামে একটি পর্বত আছে, সেখানে কামাক্ষী দেবী আছেন। সেখানে পাতালবিবরের দ্বার রুদ্ধ। কামাক্ষীমন্ত্র জপ করলেই সেই দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। সেই বিবরমধ্যে রসকুণ্ড আছে। সেই রসসংযোগে আটটি ধাতু সোনায় পরিণত হয়। আমি বারো বৎসর ধরে কামাক্ষীমন্ত্র জপ করেছি। কিন্তু বিবরদ্বার খুললো না।'

এই কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য কামাক্ষী দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং দেবীর স্তবস্তুতি করে নিজকণ্ঠে খড়্গাঘাতে উদ্যত হতেই দেবী বললেন, 'আমি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা করো।

রাজা বললেন, 'দেবি! আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই ব্রাহ্মণকে রস দান করুন।'

দেবীও 'তথাস্তু' বলে বিবরদ্বার খুলে ব্রাহ্মণকে রস দান করলেন।

ব্রাহ্মণ রাজার প্রশংসা করে নিজ নগরে গেলেন। রাজাও নিজ নগরে চলে এলেন!"

'আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই ব্রাহ্মণকে রস দান করুন।'

এই কাহিনী বর্ণনা করে, পুতুল রাজাকে বললে, "হে রাজন্! যদি আপনার এই রকম ধৈর্য ও ঔদার্য থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ মৌন হয়ে রইলেন।

———

ত্রয়োবিংশ পুতুল
চিত্ররেখা

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

রাজা আবার সিংহাসনে বসবার উপক্রম করতে আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্! যাঁর রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো উদারতা আছে তিনিই এই সিংহাসনে বসবার যোগ্য।"

ভোজরাজ বললেন, সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যবৃত্তান্ত বর্ণনা করো।"

পুতুল বললে, "রাজন্! শুনুন। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য পৃথিবী ভ্রমণ করে নিজ নগরে এলেন।

নগরবাসী সকলেরই মহা আনন্দ হলো। রাজা নিজ ভবনে গিয়ে দ্বিপ্রহরে স্নানাহ্নিক করে চন্দনবস্ত্রাদিতে সজ্জিত হয়ে দেবমন্দিরে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি ষোড়শোপচারে দেবতার পূজা করে স্তব করতে লাগলেন, 'হে দেব! তুমিই মাতাপিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই আমার সর্বস্ব।'

এইভাবে দেবতার স্তব ও নমস্কার করে ব্রাহ্মণগণকে কপিলা, ভূমি ও তিলাদি এবং দীন, অন্ধ, বধির, কুব্জ, পঙ্গু, অনাথ প্রভৃতিকে বহু পরিমাণ দ্রব্য দান করে ভোজনগৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানে বালক, সুবাসিনী নারী ও বৃদ্ধদিগকে ভোজন করিয়ে নিজে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ভোজন করলেন।

ভোজনের পর রাজা কিছুকাল বিশ্রাম করলেন। শাস্ত্রেও লিখিত আছে, ভোজনশেষে সুখে উপবেশন করলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয় এবং ভোজনশেষে দ্রুত গমন করলে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। আরও

বলা হয়, অধিক জল পান, বিষম আহার, দিবসে শয়ন, রাত্রিজাগরণ ও মলমূত্রের বেগ ধারণ, এই ছয়টি রোগের কারণ।

তারপর রাজা সন্ধ্যাকালীন কাজের শেষে আহার করে শয়নস্থানে গেলেন। সেখানে চন্দ্রকিরণের মতো শুভ্র বস্ত্রাবৃত, কুন্দ-মল্লিকা-পদ্মাদি পুষ্প বিছানো খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত্রির শেষদিকে

স্বপ্ন দেখলেন, তিনি মহিষে চড়ে দক্ষিণ দিকে চলেছেন।

স্বপ্ন দেখলেন, তিনি মহিষে চড়ে দক্ষিণ দিকে চলেছেন। স্বপ্ন দেখামাত্র বিষ্ণুকে স্মরণ করে উঠে বসলেন। তারপর প্রভাতে সন্ধ্যাবন্দনাদি করে সিংহাসনে বসে ব্রাহ্মণদের কাছে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন।

স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে সর্বজ্ঞ বললেন, 'রাজন্। স্বপ্ন অনেক রকমের। কোন কোন স্বপ্ন শুভ ফল, কোন কোন স্বপ্ন অশুভ ফল দান করে।

হস্তীতে আরোহণ, অট্টালিকায় আরোহণ, রোদন, মৃত্যু, ছত্র, চামর, সমুদ্র, ব্রাহ্মণ, গঙ্গা, পতিব্রতা নারী, শঙ্খ ও স্বর্ণ দর্শন স্বপ্ন শুভ। শাস্ত্রেও বলে, গো, বৃষ, হস্তী, প্রাসাদ, পর্বতশিখর ও বৃক্ষে আরোহণ, দেহে বিষ্ঠালেপন, রোদন, মৃত্যু এই সকল স্বপ্ন দর্শন শুভ। আর মহিষ, গর্দভ, কণ্টক-বৃক্ষে আরোহণ এবং ভস্ম, কাপাস, ধূম, ব্যাঘ্র, সর্প, শূকর ও বানরাদি স্বপ্নে দেখলে অশুভ হয়।···আরও লিখিত আছে, রাত্রিতে প্রথম প্রহরে স্বপ্ন দেখলে এক বৎসর মধ্যে, দ্বিতীয় প্রহরে দেখলে আট মাসের মধ্যে, তৃতীয় প্রহরে দেখলে তিন মাসের মধ্যে এবং যে সময়ে গরু ছেড়ে দেওয়া হয়—প্রভাতে—স্বপ্ন দেখলে তার ফল সদ্য ফলে। বেশি কি বলবো, হে রাজন্! এই স্বপ্ন আপনার পক্ষে অনিষ্টসূচক।'

রাজা বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ! এই দুঃস্বপ্নের ফল নিবারণের উদ্দেশ্যে কি করা উচিত?'

সর্বজ্ঞ ভট্ট বললেন, 'আপনি স্নান-শেষে যজ্ঞ দর্শন করে ব্রাহ্মণকে সকল রকমের অলঙ্কার ও বস্ত্র দান করুন। তারপর নবরত্ন দিয়ে তাঁদের অর্চনা করুন। ব্রাহ্মণদের গাভী ও ধান্যাদি দান করুন। আর অন্ধ, বধির, পঙ্গু, কুব্জ ও অনাথদের প্রচুর দানে সন্তুষ্ট করুন। এই সকল অনুষ্ঠানে ও ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ প্রভাবে আপনার দুঃস্বপ্ন দেখার অনিষ্ট দূর হবে।'

ভট্টের এই কথা শুনে রাজা সেই মতো অনুষ্ঠান করে ভাণ্ডারিককে তিন দিন পর্যন্ত রাশি রাশি ধন দান করতে আদেশ দিলেন। যার যত ধনে তৃপ্তি হয় তাকে সেই পরিমাণ ধন দেওয়া হলো।"

পুতুল এ কাহিনী বর্ণনা করে ভোজরাজকে বললে, "রাজন্! যদি আপনার এই রকম ধৈর্য ও ঔদার্য থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা মৌন রইলেন।

চতুর্বিংশ পুতুল
সুভগা

চতুর্বিংশ উপাখ্যান

রাজা আবার সিংহাসনে বসবার উপক্রম করতেই আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্! যাঁর বিক্রমাদিত্যের মতো উদারতাদি গুণ আছে তিনিই এই সিংহাসনে বসতে পারেন।"

ভোজরাজ বললেন, "ওহে পুতুল! তুমি সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য-বৃত্তান্ত বল।"

সে বললে, "শুনুন। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে পুরন্দর নামে একটি নগর ছিল। সেখানে মহাধনী এক বণিক বাস করতেন। তিনি তাঁর চার পুত্রকে ডেকে বললেন, 'বাছারা! আমার পর তোমরা চারজনে একসঙ্গে থাকবে না, থাকলে পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ হবে। সুতরাং আমি বেঁচে থাকতেই আমার সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠানুসারে চারজনকে ভাগ করে দিচ্ছ। তাই চারটি ভাগ করে ভাগ চারটি আমার খাটের তলায় রেখে দিচ্ছি, তোমরা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠানুসারে তা নিও।' তারাও তাতে সম্মত হলো।

তারপর সেই বণিকের মৃত্যু হলে চার ভাই এক মাস একসঙ্গে থাকলো। তারপরে প্রথমে তাদের স্ত্রীদের মধ্যে বিবাদ শুরু হলো। তখন তারা ভাবলো, 'গোলমালে দরকার কি? পিতা বেঁচে থাকতেই চারজনের জন্য সম্পত্তি ভাগ করে রেখে গেছেন। খাটের তলায় তা আছে। জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠানুসারে আমরা তা নিয়ে সুখে থাকি।'

পিতার নির্দেশমতো তারা খাটের তলা খুঁড়লো এবং চারটি

পাত্র পেলো। তাদের একটিতে মাটি, একটিতে খড়, একটিতে অস্থি ও একটিতে ছাই ছিল। তাই দেখে তারা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললে, 'আমাদের পিতা এই যে চারটি ভাগ করেছেন এর অর্থ কে জানতে পারে?' এই বলে তারা রাজসভায় গেল এবং সেখানে সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করলো, কিন্তু সভাসদেরা কেউ তার অর্থ বুঝতে পারলো না। তারপর তারা প্রতিষ্ঠানগরে গিয়ে মহাজনদের কাছে ব্যাপারটি বলতে তাঁরাও এর মীমাংসা করতে পারলেন না।

সেই সময়ে কুম্ভকারের বাড়িতে শালিবাহন ছিলেন। তিনি এই বৃত্তান্ত শুনে মহাজনদের বললেন, 'হে সভ্যগণ! ব্যাপারটির মধ্যে দুর্বোধ্য কি আছে? আর আশ্চর্যই বা কি বলছেন? এই চারজন এক ধনবানের পুত্র। এঁদের পিতা বেঁচে থাকতে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠানুসারে সম্পত্তি ভাগ করে গেছেন এই ভাবে: যেমন, জ্যেষ্ঠকে মাটি দিয়েছেন, তার অর্থ তাঁর উপার্জিত সমস্ত ভূ-সম্পত্তি তাকে দান করেছেন; দ্বিতীয়কে পোয়াল (খড়) দিয়েছেন, তার অর্থ তাকে সকল রকমের ধান্যশস্য দান করেছেন; তৃতীয়কে অস্থি দিয়েছেন, তার অর্থ সমস্ত পশু দান করেছেন আর চতুর্থকে অঙ্গার দিয়েছেন, তার দ্বারা তাকে সমস্ত সুবর্ণ দান করেছেন।'

শালিবাহন এইভাবে চারজনকে সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। তারাও সুখী হয়ে নিজ নগরে চলে গেল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও এই বিভাগ-বৃত্তান্তের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে প্রতিষ্ঠানগরে একখানি পত্র পাঠালেন। তাতে 'স্বস্তি শ্রীযজন, যাজন, অধ্যাপন অধ্যয়ন, দান, প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্মনিরত প্রতিষ্ঠা-নগরবাসী মহাজনগণকে কুশল প্রশ্ন সহকারে রাজা বিক্রমাদিত্য আদেশ দান করছেন যে, আপনাদের নগরে এই চার রকমের বিভাগ নির্ণয়কারী যিনি আছেন তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

মহাজনেরা বিক্রমাদিত্যের পত্র শালিবাহনের সম্মুখে পাঠ করে বললেন, 'শালিবাহন! রাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, সসাগরাধিপতি,

সকল কলাবিদ্যার কল্পতরু স্বরূপ, উজ্জয়িনীবাসী বিক্রমাদিত্য রাজা আপনাকে ডাকছেন। আপনি সেখানে যান।'

শালিবাহন বললেন, 'বিক্রমাদিত্য রাজা কে? তাঁর ডাকে যাবো না। যদি তাঁর দরকার থাকে তিনি নিজে আমার কাছে আসতে পারেন। তাঁর কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই।'

শালিবাহনের এই কথা শুনে মহাজনেরা রাজার পত্রের উত্তর দিলেন, 'তিনি যেতে রাজী নন।'

বিক্রমাদিত্য চিঠির কথা শুনে রাগে জ্বলে উঠলেন, এবং আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে রাজধানী থেকে যাত্রা করে প্রতিষ্ঠানগরে গিয়ে শালিবাহনের কাছে দূত পাঠিয়ে দিলেন।

দূতগণ শালিবাহনের কাছে গিয়ে বললে, 'বিক্রমাদিত্য রাজা আপনাকে ডাকছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান।'

শালিবাহন বললেন, 'হে দূতগণ! আমি একা রাজার সঙ্গে দেখা করবো না, ষড়ঙ্গ সেনা সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। তোমরা রাজার কাছে গিয়ে জানাও।'

তাঁর কথা দূতেরা রাজার কাছে এসে জানালো। তাই শুনে রাজা বিক্রমাদিত্যও যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। শালিবাহনও কুম্ভকারের বাড়িতে মাটি দিয়ে হাতী, ঘোড়া, রথ, পদাতিক, চতুরঙ্গ সেনা গঠন করে তাদের মন্ত্রে জীবন দান করে সঙ্গে নিয়ে রণক্ষেত্রে এলেন।

দুই দল যুদ্ধের জন্য বার হবার সময়ে দিক্‌চক্র বিচলিত হয়ে উঠলো, সাগর বিক্ষুব্ধ হলো, পৃথিবী কাঁপতে লাগলো এবং মহাবিষধর সাপের ফণা নুয়ে পড়লো।...তখন বায়ুবেগের সমান অসংখ্য অশ্ব ও মদোন্মত্ত হস্তিপালে সৈন্যগণ সুন্দর শোভা পেতে লাগলো। পতাকা, চামর ও চমৎকার বস্ত্রে আকাশ ঢেকে গেল। ঢাক ও মৃদঙ্গশব্দে দিকগুলি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

তারপর দুই দল মিলিত হলো। তখন অশ্বাদির পায়ে পায়ে

ধুলা উঠে সারা আকাশ ছেয়ে গেল। অসংখ্য ছাতায় আকাশ ঢাকা পড়লো। ভেরীধ্বনি, ঘর্ঘর, হাতী-ঘোড়ার হুঙ্কার, কিঙ্কিণীর শব্দ ও বীরগণের ভয়ঙ্কর রবে আকাশ-ধরণী ভরে উঠলো।

দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো। সেই যুদ্ধে কেউ কেউ বিপক্ষ কর্তৃক আহত ও গতাসু হয়ে ভূতলশায়ী হতে লাগলো; কেউ কেউ মূর্ছিত হয়ে ক্ষণকাল পরেই নিজশক্তি সাহায্যে আবার উঠতে লাগলো; কেউ কেউ অট্টহাস্যে নিজ পরাজয় দূর করে আগের মতো প্রসন্ন হয়ে মৃত্যুভয় দূর করলো এবং যথাযথ অস্ত্র ধারণ করে আগে আগে ছুটলো। কেউ কেউ বিপক্ষগণের অন্তরে ভয় ও আতঙ্কের সঞ্চার করতে লাগলো, কেউ কেউ ভীষণ আঘাতে প্রাণ হারিয়ে স্বর্গে গেল; আবার কোন কোন শত্রুর অস্ত্রে কোন কোন বীরের উরু কেটে দুখানা হয়ে গেল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ছুরিকা প্রভৃতি অস্ত্রগুলিকে মাছের মতো দেখা যেতে লাগলো। কেশ, স্নায়ু, শিরা ও অস্ত্র সকল সেই রণসাগরে শৈবালের মতো দেখাতে লাগলো; রক্ত-নদীর মধ্যে হাতী ও ঘোড়ার শবগুলিকে প্রেতের ও অস্থিগুলিকে শঙ্খের মতো দেখাতে লাগলো।

তারপর শালিবাহনের সমস্ত সৈন্য বিক্রমাদিত্য বধ করলেন। তখন শালিবাহন স্মরণ করলেন শেষনাগকে। স্মরণ করামাত্র শেষনাগ অসংখ্য সর্প পাঠালেন। সেই সব সর্প রণক্ষেত্রে এসে বিক্রমাদিত্যের সৈন্যদের দংশন করলে তারা মূর্ছিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হলো। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য একা নিজনগরে ফিরে গেলেন। তিনি সৈন্যদের পুনর্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে জলে অর্ধমগ্ন হয়ে নয় বৎসর বাসুকি-মন্ত্র জপ করলেন। তখন বাসুকি প্রসন্ন হয়ে রাজাকে বললেন, 'রাজন! বর গ্রহণ কর।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, সর্পরাজ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তা হলে সর্পবিষে মূর্ছিত সৈন্যদের পুনর্জীবিত করবার জন্য অমৃতকুম্ভ দান করুন।'

বাসুকি তৎক্ষণাৎ অমৃতপূর্ণ ঘট দান করলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য সেই অমৃতভরা ঘট নিয়ে পথ দিয়ে চলেছেন এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ এসে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

বাসুকি তৎক্ষণাৎ অমৃতপূর্ণ ঘট দান করলেন।

রাজা বললেন, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

ব্রাহ্মণ বললেন, আমি প্রতিষ্ঠানগর থেকে আসছি।'

রাজা বললেন, 'কি বলছেন?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আপনি প্রার্থিগণের চিন্তামণি। যা চিন্তা করা যায় আপনি তাই দিতে পারেন। কাজেই একটি জিনিসে আমার কাম্য। যদি তা দান করেন তবে বলি।'

রাজা বললেন, 'আপনি যা প্রার্থনা করবেন আমি তাই দেবো।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমাকে ঐ অমৃতঘট দান করুন।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাকে কে পাঠিয়েছে?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'শালিবাহন আমাকে পাঠিয়েছেন।'

এই কথা শুনে রাজা মনে মনে বিচার করলেন, 'আমি দান করবো বলে পূর্বে প্রতিশ্রুত। এখন যদি না দিই, অপযশ ও অধর্ম হবে। অতএব দান করাই কর্তব্য।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'কি ভাবছেন? আপনি সজ্জন। সজ্জনের বাক্য কখনও অন্যথা হয় না। শাস্ত্রেও বলে, যদি সূর্য পশ্চিমে উদয় হয়, সুমেরুপর্বত বিচলিত হয়, অগ্নি শীতলতা লাভ করে, পর্বতশিখরে পদ্ম ফোটে তবু সজ্জনের বাক্য মিথ্যা হয় না।'

রাজা বললেন, 'আপনি সত্যই বলেছেন। তাই হোক। আপনি অমৃতঘট নিন।'

রাজা ব্রাহ্মণকে অমৃতঘট দান করলেন। ব্রাহ্মণ রাজার স্তুতিবাদ করে নিজ নগরে চলে গেলেন। রাজাও উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন।"

পুতুল এই কাহিনী বর্ণনা করে ভোজরাজকে বললে, "রাজন্! যদি আপনার এই রকম উদারতা ও ধৈর্য থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ অধোবদনে রইলেন।

পঞ্চবিংশ পুতুল প্রিয়দর্শনা

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার যখন সিংহাসনে বসবার উপক্রম করলেন তখন আর একটি পুতুল বললে, "হে রাজন্! বিক্রমাদিত্যের মতো যাঁর ঔদার্যাদি গুণ আছে তিনিই এই সিংহাসনে বসবেন।"

রাজা বললেন, "সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য-বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।"

পুতুল বললে, "শুনুন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে এক জ্যোতির্বিদ্ এসে তাঁকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন, 'সূর্য আপনাকে বীরত্ব, চন্দ্র ইন্দ্রত্ব, মঙ্গল সুমঙ্গল, বুধ বুদ্ধি, বৃহস্পতি গুরুত্ব, শুক্র পুত্র, শনি কল্যাণ, রাহু বাহুবল ও কেতু বংশের উন্নতি দান করুন। এই সব গ্রহ আপনার প্রতি অনুকূল হয়ে প্রীতিপ্রদ হোন।'

এই আশীর্বাদ করে তিনি পঞ্চাঙ্গ বর্ণনা করলেন।

তারপর রাজা জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে দৈবজ্ঞ! এই বৎসরে কে রাজা, কে মন্ত্রী ইত্যাদি বর্ণনা করুন।'

তিনি বললেন, 'সূর্য রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী ও মেঘাধিপতি। শনিগ্রহ রোহিণীশকট ভেদ করে যাবেন। সেজন্য সর্বত্র অনাবৃষ্টি ঘটবে। বরাহমিহির সংহিতায় উক্ত আছে, শনিগ্রহ যখন রোহিণীশকট ভেদ করেন তখন দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হয়। বেশি কথা কি, সাগরেও জল থাকে না। সর্বলোক বিনষ্ট হয়। কারো কারো মতে শনি রোহিণীশকট ভেদ করলে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হয়।'

দৈবজ্ঞের কথা শুনে রাজা বললেন, 'অনাবৃষ্টি শান্তির কোন উপায় আছে কি?'

দৈবজ্ঞ বললেন, 'কেন থাকবে না? গ্রহহোম করলেই বৃষ্টি হবে।'

তখন রাজা ব্রাহ্মণদের ডেকে তাঁদের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বলতে তাঁরা হোম করতে আরম্ভ করলেন।

রাজা সকলের দুঃখে দুঃখিত হয়ে নিজ যজ্ঞগৃহে বসে চিন্তা করছেন।

হোমের সমস্ত জিনিস আনা হলো। রাজা নানা রকমের জিনিস, অন্ন ও বস্ত্রাদি দানে ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্ট করে দশবিধ দান করলেন। তারপর দীন, অন্ধ, বধির, পঙ্গু, অনাথ প্রভৃতিকে যথেষ্ট দান করে তাদের সন্তুষ্ট করলেন, তবু বৃষ্টি হলো না। বৃষ্টির অভাবে সকলে ক্ষুধার্ত হয়ে অত্যন্ত কষ্ট পেতে লাগলো। রাজা সকলের দুঃখে দুঃখিত হয়ে একদিন নিজ যজ্ঞগৃহে বসে চিন্তা করছেন,

এমন সময়ে দৈববাণী হলো, 'হে রাজন্। যদি বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত কোন পুরুষের শিরশ্ছেদন করে দেবতার সম্মুখে বলিদান করতে পারো তা হলে এই নগরের মন্দিরবাসিনী দেবী তোমার আশা পূর্ণ করবেন, বৃষ্টি হবে।'

তাই শুনে রাজা দেবালয়ে গিয়ে দেবীকে নমস্কার করে যেমন খড়্গ দিয়ে নিজের শিরশ্ছেদ করতে যাবেন অমনি দেবতা খড়্গ ধারণ করে বললেন, 'হে রাজন্! তোমার ধৈর্যে আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর প্রার্থনা কর।'

রাজা বললেন, 'হে দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে অনাবৃষ্টি নিবারণ করুন।'

দেবতা বললেন, 'তাই করবো।'

তারপর রাজা নিজ সভায় চলে এলেন।"

এই কাহিনী বর্ণনা করে পুতুল বললে, "হে রাজন্।' যদি আপনার মধ্যেও এই রকম ধৈর্য ও পরোপকারবাসনা থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা মৌন রইলেন।

ষড়বিংশ পুতুল কামোন্মাদিনী
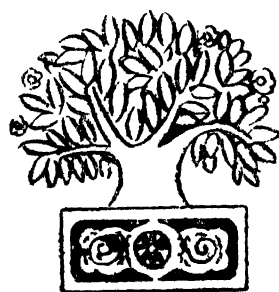
ষড়বিংশ উপাখ্যান

রাজা আবার যখন সিংহাসনে বসবার উপক্রম করলেন তখন অন্য পুতুল বললে, "রাজন্! রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো যাঁর ঔদার্যাদি গুণ তা তিনিই এই সিংহাসনে বসবার যোগ্য।"

ভোজরাজ বললেন, "সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য-বৃত্তান্ত কীর্তন কর।"

পুতুল বললে, "শুনুন। ঔদার্য, বিবেক, ধৈর্য প্রভৃতি গুণে বিক্রমাদিত্যের সমান আর কেউ ছিল না। তিনি যা বলতেন তার অন্যথা করতেন না। যা তাঁর মনে উদয় হতো তাই বলতেন, যা বলতেন তাই করতেন; অতএব তিনি ছিলেন সজ্জন। শাস্ত্রেও বলে, মন যেমন বাক্যও তেমন, বাক্য যেমন কাজও তেমন। সুতরাং সাধুদের মন, বাক্য ও কাজ একই প্রকার।

একদিন দেবগণের অমরাবতী নগরে দেবরাজ ইন্দ্র সিংহাসনে বসে আছেন। সেই সভাতে অষ্টাশী হাজার ঋষি, তেত্রিশ কোটি দেবতা, আটজন দিক্‌পাল, বারোজন আদিত্য, নারদ, তুম্বুরু, উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, ঘৃতাচী, মঞ্জুঘোষা, প্রিয়দর্শনা প্রভৃতি দিব্যাঙ্গনাগণ ও গন্ধর্বগণও বসে আছেন।

সেই সময়ে নারদ বললেন, 'পৃথিবীতে বিক্রমাদিত্যের মতো কীর্তিমান্, পরোপকারী ও মহাসত্ত্বসম্পন্ন রাজা আর নেই।'

তাঁর কথা শুনে দেবসভাস্থ সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

কামধেনুও বললেন, 'এতে আর সন্দেহ কি ? বিস্ময়েরও কিছু নয়। শাস্ত্রে বলে, দান, তপস্যা, শৌর্য, বিজ্ঞান, বিনয় ও নয়ে বিস্ময়ের কিছু নেই। বসুন্ধরা বহু রত্নের আকর। আরও দেখ, অশ্ব, গজ, লৌহ, নারী, পুরুষ ও জল এদের প্রভেদও অনেক।'

তারপর ইন্দ্র সুরভিকে বললেন, 'তুমি মর্ত্যলোকে গিয়ে বিক্রমাদিত্যের দয়া ও পরোপকারাদি গুণের পরীক্ষা করে এসে আমার কাছে বল।'

তখন সুরভি অত্যন্ত দুর্বল গোরূপ ধারণ করে মর্ত্তলোকে গেলেন।

বিক্রমাদিত্য যখন ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন সুরভি দুস্তর পাঁকে পড়লেন, এবং রাজার দিকে তাকিয়ে কাতরভাবে চিৎকার করতে লাগলেন। রাজা তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন গাভীটি গভীর পাঁকে পড়েছে এবং তার কাছে একটি বাঘ বসে আছে। রাজা গাভীটিকে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এদিকে সূর্যাস্ত হলো। রাজাও সেই অনাথা গাভীকে রক্ষা করবার জন্য সেখানে রইলেন। তারপর সূর্য উঠলো। তখন সুরভি রাজার দয়া ও ধৈর্যাদি গুণ দেখে নিজেই পাঁক থেকে উঠলেন এবং রাজাকে সম্বোধন করে বললেন, 'রাজন্। আমি সুরভি ধেনু। তোমার দয়াদি গুণ পরীক্ষার জন্য স্বর্গ থেকে এসেছি। এখন আমার বিশ্বাস হলো, তোমার মতো দয়াশীল রাজা ভূ-মণ্ডলে আর নেই। আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর প্রার্থনা করো।'

রাজা বললেন, আপনার প্রাসাদে আমার কিছুরই অভাব নেই। আমি কি প্রার্থনা করবো ?'

সুরভি বললেন, 'আমার কথা কখনো নিষ্ফল হয় না। আমি তোমার কাছেই থাকবো।'

এই বলে সুরভি রাজার সঙ্গে চললেন।

রাজা সুরভির সঙ্গে যখন চলেছেন, তখন পথে এক ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে একটি শ্লোক আবৃত্তি করে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বললেন, 'রাজন্! বিধির বিধানে আমি দরিদ্র! সুতরাং আমি সকলকে দেখতে পাই। আমাকে কেউ দেখতে পায় না। হে দারিদ্র্য! তোমাকে নমস্কার। তোমার প্রসাদে আমি সিদ্ধপুরুষ হয়েছি। কারণ, সমস্ত জগৎসংসার আমি দেখতে পাই, কিন্তু আমাকে কেউ দেখতে পায় না। যে লোক সকল সময়ে দারিদ্র্যে থাকে তার গৃহে নিত্য সূতিকাশৌচ।···আমার এই পুত্রজনিত অশৌচ

রাজাও সেই অনাথা গাভীকে রক্ষা করার জন্য সেখানে রইলেন

আজীবন দূর হচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কে জন্মগ্রহণ করেছে? তার উত্তরে বলি, 'সকল রকমের ধনহীন দারিদ্র্য নামে আমার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে।'

রাজা বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ! আপনি কি প্রার্থনা করেন?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'রাজন্! আপনি আশ্রিতের কল্পতরু। যা' তে যাবজ্জীবন আমার দারিদ্র্য দূর হয় তাই করুন।'

রাজা বললেন, 'তবে আপনি এই কামধেনুটি গ্রহণ করুন। ইনি যাবজ্জীবন আপনার অভীষ্ট পূর্ণ করবেন।' এই বলে রাজা ব্রাহ্মণকে কামধেনু দান করলেন।

ব্রাহ্মণ যেন স্বর্গসুখ লাভ করলেন। তিনি কামধেনুটি গ্রহণ করে নিজগৃহে চলে গেলেন। রাজাও নিজ নগরে ফিরে এলেন।"

পুতুল এই কাহিনী বর্ণনা করে ভোজরাজকে বললে, "রাজন্! যদি আপনাতেও এই রকম ঔদার্য থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা নীরব হয়ে রইলেন।

সপ্তবিংশ পুতুল সুখসাগরা

সপ্তবিংশ উপাখ্যান

রাজা আবার যখন সিংহাসনে বসবার উদ্যোগ করলেন, তখন অন্য পুতুল বললে, "রাজন্! বিক্রমাদিত্যের মতো যাঁর ঔদার্যাদি গুণ আছে তিনিই এই সিংহাসনে বসতে পারেন।"

রাজা বললেন, "সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যাদি গুণ বর্ণনা করো।"

পুতুল বললে, "শুনুন। রাজা বিক্রমাদিত্য পৃথিবী পর্যটন করে এক নগরে গেলেন। সেখানে এক ধার্মিক ও আচারনিষ্ঠ রাজা বাস করতেন। সেখানকার ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সমস্ত অধিবাসীকে তিনি ঠিকমতো প্রতিপালন করতেন। অধিবাসীরাও সদাচারবান্, অতিথিপ্রিয় ও দয়াশীল ছিল। রাজা বিক্রমাদিত্য সেই নগরে তিন বা পাঁচদিন থাকবার সঙ্কল্প করে একটি সুন্দর দেবালয়ে উপস্থিত হলেন এবং দেবতাকে প্রণাম করে রঙ্গমণ্ডপে বসলেন।

সেই সময়ে রাজপুত্রের মতো রূপবান্ একটি পুরুষ সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরনে পট্টবস্ত্র, দেহ নানা রকমের অলঙ্কারে সজ্জিত এবং কুঙ্কুম, কর্পূর, কস্তুরী, মৃগমদমিশ্রিত চন্দনে লিপ্ত। তাঁর সঙ্গে আর যে সব লোক ছিল তিনি তাদের সঙ্গে নানাবিধ কথোপ-কথন ও প্রস্তাবে আনন্দ উপভোগ করে আবার তাদের সঙ্গে সেখান থেকে বার হয়ে গেলেন। রাজা তাঁকে দেখে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এ কে?

তারপর দ্বিতীয় দিনেও সেই সুপুরুষ সেখানে একাকী এসে দেবালয়ের রঙ্গমণ্ডপে বসলেন। এবার তাঁর পরিধানে বস্ত্রাদি ছিল না, কৌপীন মাত্র পরে এসেছিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেবদত্ত! তুমি আগের দিন রাজপুত্রের মতো বেশভূষা করে বয়স্যদের সঙ্গে এখানে এসেছিলে, আজ তোমার এমন কষ্টের দশা কেন?'
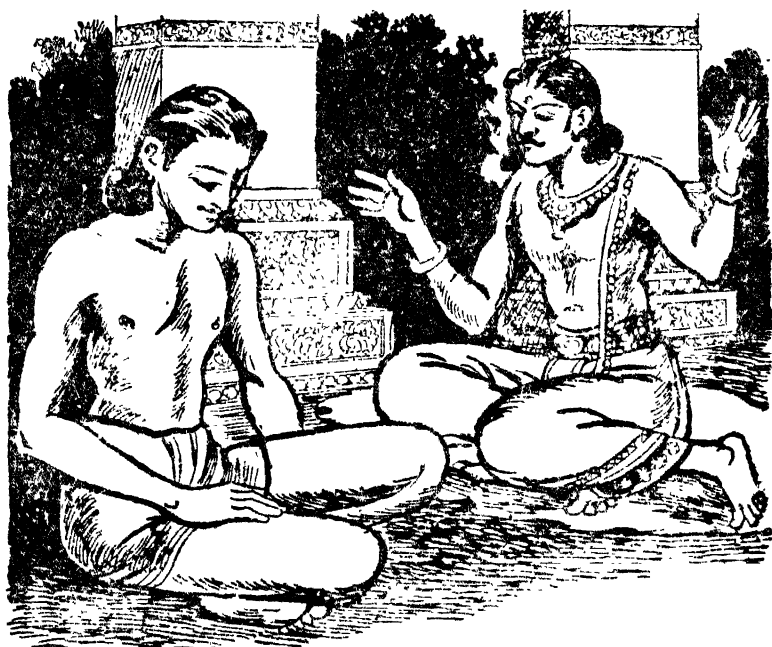
বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেবদত্ত, আজ তোমার এমন কষ্টের দশা কেন?'

তিনি বললেন, 'স্বামিন্! কি বা বলি? আগের দিন আমি সেই রকম ছিলাম সত্য কিন্তু সম্প্রতি দৈবযোগে আমার এই দশা হয়েছে। কথিত হয়, যে ভ্রমরেরা ফোটা পদ্মফুলের স্পর্শে সুগন্ধীমাখা হয়ে হস্তিগণের গণ্ডের মদজলে পুষ্ট হয়েছিল তারাই এখন চত্বরে নিম ও আকন্দফুলে বসে কাল যাপন করছে। আরও দেখ, যে

মৌমাছি আম্রমুকুল ও তালফুলের গন্ধে খেলা করতো এখন দুর্ভাগ্য-বশে, সে শরভভরা আকন্দবনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে কলহংসেরা আগে মন্দাকিনীর স্বচ্ছজলে উৎপন্ন চঞ্চল পদ্মের স্বর্ণবর্ণ রেণুর মধ্যে পুষ্ট হয়েছিল, এখন দৈববশে তারা শেওলাদলে জটিল জলমধ্যে চলেছে।...কর্মবদ্ধ প্রাণীরা কোন্ কষ্ট না পায়?'

রাজা বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে?'

সেই পুরুষ বললেন, 'আমি দ্যূতকার।'

রাজা বললেন, 'তুমি কি পাশাখেলা জান?'

তিনি বললেন, 'আমি পাশাখেলা জানি। এ ছাড়া আমি সারিখেলা জানি, বুদ্ধিবলও জানি; কিন্তু আমার সকলই বিফল। দৈবই বলবান্।...আরও দেখুন, আকার, বংশ, চরিত্র, বিদ্যা ও যত্নকৃত সেবা কিছুই সফল হয় না। কেবল অর্জিত তপস্যাই যথাকালে বৃক্ষের মতো ফলবতী হয়।'

রাজা বললেন, 'দেবদত্ত! তুমি এমন বিচক্ষণ হয়ে এই পাপ পাশাখেলায় নিযুক্ত হয়েছো কেন?'

সেই পুরুষ বললেন, 'বিচক্ষণ লোকও কর্মের প্রেরণায় কি না করে?...মানুষের বুদ্ধি কর্মের অনুসরণ করে থাকে।'

রাজা বললেন, 'পাশাখেলা আপদের মূল ও সকল রকমের দোষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পাপীদের আশ্রয়, নরকের ভীষণ পথ। কোন্ শুদ্ধমতি লোক সেই পাশাখেলার সমর্থন করে?...মোহের বশে পাশাখেলায় যে দুঃখ ভোগ করতে হয়, তার সঙ্গে কোন দুঃখেরই তুলনা হয় না! এইজন্যই সাত রকমের ব্যসন (দোষ) যা মহাপাপ তা পরিত্যাগ করা উচিত। শাস্ত্রেও বলে, পাশা, মাংস, মদ, কাম, বেশ্যা, চৌর্য ও পরদার এই সাত রকমের দোষ পরিত্যাগ করা বিদ্বানের কর্তব্য। আরও দেখ, যে লোক একটিমাত্র ব্যসনে অনুরক্ত হয়, সে কিছুই দেখতে পায় না। তার উপর যদি ঐ সাত রকমের ব্যসনে অনুরক্ত হয়, তা হলে আর কথা কি? দেখ, পাশায় যুধিষ্ঠির,

মাংসে বকাসুর, মদে যদুকুল, কামে চৌর, মৃগয়ায় রাজা ব্রহ্মদত্ত, চৌর্যে শিবভূতি ও পরদারে রাবণ নিহত হয়েছে। কাজেই যখন একটি ব্যসনের ফলে ঐ সকল ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করেছে তখন সমস্ত ব্যসন দ্বারা কে একেবারে না বিনষ্ট হয়? অতএব তুমি এই ব্যসন পরিত্যাগ কর।'

দ্যূতকার বললেন, 'স্বামিন্! পাশাখেলাই আমার জীবন। কি উপায়ে তা পরিত্যাগ করবো? যদি আপনি দয়া করে আমায় ধন উপার্জনের উপায় করে দেন তবে আমি পাশাখেলা পরিত্যাগ করি।'

সেই সময়ে দুটি বিদেশী ব্রাহ্মণ এসে দেবালয়ের একপাশে বসে নিজেরা কথোপকথন করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমি পিশাচলিপি দেখেছি। তাতে লেখা আছে, এই দেবালয়ের পাঁচ ধনুর সমান দূরে ঈশান কোণে স্বর্ণমুদ্রাভরা তিনটি কলসী আছে। তার কাছে ভৈরবমূর্তি আছে। যে নিজের কণ্ঠরক্ত দিয়ে ভৈরবদেবকে সন্তুষ্ট করতে পারবে সে ঐ ধন পাবে।'

রাজা বিক্রমাদিত্য এই কথা শোনামাত্র সেখানে গিয়ে যেমন আপনার দেহরক্ত দিয়ে ভৈরবদেবকে সন্তুষ্ট করলেন অমনি ভৈরবদেব বললেন, 'রাজন্! বর প্রার্থনা করো।'

রাজা বললেন, 'এই দ্যূতকারকে স্বর্ণমুদ্রাভরা তিনটি কলসী দান করুন।'

ভৈরবদেব তাই করলেন।

দ্যূতকার রাজার গুণগান করে স্বনগরে চলে গেলেন। রাজাও নিজ রাজধানীতে ফিরে এলেন।"

পুতুল এই কাহিনী বর্ণনা করে ভোজরাজকে বললেন, "রাজন্! যদি আপনার মধ্যেও এই রকম ঔদার্য ও পরোপকারিতা গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা নীরব রইলেন।

অষ্টাবিংশ পুতুল
শশি-কলা

অষ্টাবিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসবার উপক্রম করলে অন্য পুতুল বললে, "রাজন্! যিনি বিক্রমাদিত্যের মতো ধৈর্যাদিগুণযুক্ত, তিনিই এই সিংহাসনে বসবার যোগ্য।"

ভোজরাজ বললেন, "পুত্তলিকে! সেই রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যবৃত্তান্ত বর্ণনা করো।"

পুতুল বললে, "রাজন্! শুনুন। রাজা বিক্রমাদিত্য পৃথিবী পর্যটন করে একটি নগরে উপস্থিত হলেন। সেই নগরের কাছে এক নির্মলজলপূর্ণ নদী বইছে। নদীতীরে নানাবিধ ফুলফলবান্-তরুভরা বন ছিল। তার মধ্যে ছিল একটি সুন্দর দেবালয়। রাজা সেই নদীজলে স্নান ও দেবতাকে নমস্কার করে দেবালয়ে বসলেন।

তারপর চারজন বিদেশী এসে রাজার কাছে বসলো। তখন রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?'

তাদের মধ্যে একজন বললে, 'আমরা এক অপূর্ব দেশ থেকে আসছি।'

রাজা বললেন, 'সে দেশে আশ্চর্য কী দেখেছেন?'

সে বললে, 'সেখানে বেতালপুরী নামে এক নগর আছে। সেই নগরে শোণিতপ্রিয়া নামে এক দেবতা থাকেন। সেখানকার রাজা ও মহাজনেরা নিজ নিজ মনোরথ পূর্ণ এবং অশুভনিবারণের জন্য সেই দেবতাকে একটি করে পুরুষ উপহার দেন। সেই দিনে যদি

কোন বিদেশী আসেন তা হলে তাকেই পশুর মতো, দেবতাকে উপহার দেওয়া হয়। আমরাও পথ চলতে চলতে সেই দিনে সেই নগরে গিয়ে পড়ি, তখন সেখানকার সকলে আমাদের ধরতে আসে। তাই দেখে শুনে আমরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। আমরা এই আশ্চর্য দেখেছি।'

তাই শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য সেখানে গিয়ে দেবতাকে প্রণাম করে তাঁর ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শনে তাঁর স্তব করতে লাগলেন, 'ব্রহ্মাণী, কমলা, চন্দ্রতুল্যা সুন্দরমুখী মাহেশ্বরী, শত্রুক্ষয়কারী কৌমারী, চক্রপাণি বৈষ্ণবী, ঘন-ঘর্ঘরস্বরা বারাহী, বজ্রহস্তা ইন্দ্রাণী, গণপতি ও রুদ্র সমন্বিতা মাতৃগণ আমাকে রক্ষা করুন।'

এইভাবে স্তব করে রাজা বিক্রমাদিত্য রঙ্গমণ্ডপে বসলেন।

এই সময়ে মলিনমুখ একটি লোককে মহাজনগণ বাজনা বাজাতে বাজাতে সেখানে নিয়ে এলেন। রাজাও তাকে দেখে মনে মনে বিচার করতে লাগলেন, বোধহয় দেবতাকে উপহারদানের উদ্দেশ্যে মহাজনেরা লোকটিকে নিয়ে এসেছে। এইজন্য এর মুখ অত্যন্ত ম্লান। এখন নিজ শরীর দান করে একে মুক্ত করতে হবে। এই শরীর শত শত বৎসর জীবিত থাকলেও নিঃসন্দেহে বিনষ্ট হবে। সুতরাং নিজ শরীর ব্যয় করেও ধর্ম ও যশ উপার্জন করা দেহিগণের কর্তব্য। শাস্ত্রেও বলে—লক্ষ্মী চঞ্চলা, প্রাণ এবং দেহও চঞ্চল, সংসার অস্থির, কেবল কীর্তি ও ধর্ম অটল। আরও কথিত হয়, দেহ নিত্য নয়, ঐশ্বর্যও বিনাশশীল, মৃত্যু সর্বদাই নিকটবর্তী। কাজেই ধর্ম সংগ্রহ করা কর্তব্য। আবার, অর্থ চরণধূলির মতো, যৌবন পর্বত-নিঃসৃত নদীর প্রবাহবেগের মতো, পরমায়ু বারিবুদ্‌বুদের মতো চঞ্চল, জীবন ফেনসদৃশ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং যে একমনে ধর্ম উপার্জন না করে, তাকে, জরাজীর্ণ হয়ে শোকে দগ্ধবিদগ্ধ হতে হয়।

রাজা মনে মনে এই চিন্তা করে, মহাজনদের বললেন, 'এই ম্লানমুখ লোকটিকে নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছো?'

মহাজনেরা বললেন, 'একে দেবতার কাছে বলি দেবো।'

রাজা বললেন, 'কি কারণে?'

মহাজনেরা বললেন, 'দেবতা এই বলিতে প্রসন্ন হয়ে আমাদের মনোরথ পূর্ণ করবেন।'

রাজা বললেন, 'এই লোকটির শরীর ক্ষীণ, তার ওপর লোকটি

'তোমরা একে ছেড়ে দাও। ঐ উদ্দেশ্যে আমার শরীর দান করবো।'

ভয়ে বিহ্বল। এর শরীর উপহার দিলে দেবতার কি তৃপ্তি হবে? তোমরা একে ছেড়ে দাও। ঐ উদ্দেশ্যে আমার শরীর দান করবো। আমি স্থূলশরীর, আমার মাংসে দেবতা তৃপ্ত হবেন। অতএব আমাকে হত্যা করো।'

এই বলে সেই লোকটিকে মুক্ত করে রাজা স্বয়ং দেবীর সম্মুখে গিয়ে যেমন নিজকণ্ঠে খড়্গের আঘাত করতে যাবেন অমনি দেবী তাঁর কণ্ঠ চেপে ধরে বললেন, 'হে মহাসত্ত্ব। তোমার ধৈর্য ও পরোপকারে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।'

রাজা বললেন, 'দেবি! যদি আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে আজ থেকে নরমাংস পরিত্যাগ করুন।'

দেবতা বললেন, 'তথাস্তু।'

তখন মহাজনেরা বললেন, 'হে রাজন্! আপনি সুখী হয়েও বৃক্ষের মতো পরের জন্য দেহ ধারণ করছেন। শাস্ত্রেও বলে, বৃক্ষগণ নিজ শিরে দারুণ রৌদ্রতাপ সহ্য করেও ছায়াদানে আশ্রিত লোকের তাপ দূর করে। প্রত্যহ লোকের মঙ্গলের জন্য তারা এই রকম করে থাকে। অথবা তাদের স্বভাবই এই।'

তারপর রাজা তাদের আদেশ নিয়ে নিজ নগরে চলে গেলেন।"

এই উপাখ্যান বর্ণনা করে পুতুল বললে, "রাজন্! আপনাতেও যদি সেই রকম ধৈর্য, ঔদার্য ও পরোপকার গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

ভোজরাজ নীরব রইলেন।

উনত্রিংশ পুতুল
চন্দ্র-রেখা

উনত্রিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসবার উপক্রম করলেন। তখন অন্য পুতুল বললে, "রাজন্! যাঁর বিক্রমাদিত্যের মতো উদারতা গুণ আছে তিনিই এই সিংহাসনে বসবার যোগ্য।"

ভোজরাজ বললেন, "সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যগুণ বর্ণনা কর।"

পুতুল বললে, "শুনুন। একদিন বিক্রমাদিত্য সভায় বসে আছেন। রাজকুমারগণ তাঁর উপাসনা করছেন। একসময়ে এক স্তুতিপাঠক এসে তাঁকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন, 'রাজন্! যাবৎ পবিত্রসলিলা দেবনদী গঙ্গা কল্লোল ও তরঙ্গের সঙ্গে বইতে থাকবেন, যাবৎ সূর্যদেব জগতে কিরণ দান করবেন, যাবৎ সুমেরুশৃঙ্গে ইন্দ্রনীলমণি ও স্ফটিকশিলা বিদ্যমান থাকবে, ততকাল আপনি পুত্র. পৌত্র ও আত্মীয়গণ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজ্যভোগ করুন।'

এইভাবে আশীর্বাদ করে স্তুতিপাঠক রাজার স্তব করতে লাগলেন, 'রাজন্! আপনি প্রার্থিগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ। একথা জেনে আমি আপনার কাছে এসেছি। আজ আমি দারিদ্র্য-রোগ থেকে মুক্ত হবো।···আপনাকে দেখে আমার ধনেশ্বর নামে এক রাজার কথা মনে হচ্ছে। তিনি উত্তরদিকে জম্বীরনগরে রাজত্ব করেন। তিনি দারিদ্র্যদুঃখ দূর করতে প্রার্থিগণকে ধন বিতরণ করেছিলেন। কোন সময়ে মাঘ মাসে শুক্লা সপ্তমী তিথিতে সেই

ধনেশ্বর রাজা বসন্তপূজা করেছিলেন। অসংখ্য বৈদেশিক প্রার্থী সমাগত হয়েছিল। রাজা সেই সময়ে আট কোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিলেন। উদারতায় সর্বশ্রেষ্ঠ সেই রাজার মতো এই রাজ্যে আপনাকেই এই রাজ্যের দাতা দেখা যাচ্ছে।'

তাঁর কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য ভাণ্ডারিককে ডেকে বললেন, 'ভাণ্ডারিক! এই স্তুতিপাঠককে কোষাগারে নিয়ে যাও। মহামূল্য

এইভাবে আশীর্বাদ করে স্তুতিপাঠক রাজার স্তব করতে লাগলেন।

রত্নরাজি দেখাও। ইনি যে সকল রত্ন ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য নিতে ইচ্ছা করেন, সে-সব এঁকে দান কর।'

তারপর ভাণ্ডারিক সেই স্তুতিপাঠককে কোষাগারে নিয়ে গিয়ে অসংখ্য দিব্য সামগ্রী দেখালেন। স্তুতিপাঠক নিজ ইচ্ছামতো জিনিস ও রত্নরাজি নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে রাজার কাছে ফিরে এসে

বললেন, 'রাজন্! আপনি মহেশ্বর, আমি আপনার কৃপায় ধনের অধিপতি হলাম। আপনার নিধিসকল আমার হস্তগত হয়েছে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে আপনার মতো সাধু আর কোথাও দেখা যায় না।... কোন্ দেবতার সঙ্গে আপনার তুলনা হবে?'

এই বলে স্তুতিপাঠক রাজাকে 'ব্রহ্মার মতো আয়ুষ্মান হোন্।' এই আশীর্বাদ করে নিজস্থানে চলে গেলেন।"

পুতুল এই কাহিনী বর্ণনা করে ভোজরাজকে বললে, "রাজন্! যদি আপনাতে এইরূপ ঔদার্যগুণ থাকে তাহলে এই সিংহাসনে বসুন।"

রাজা নীরব হয়ে রইলেন।

ত্রিংশ পুতুল
হংস-গামিনী

ত্রিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসবার উপক্রম করতেই আর একটি পুতুল বললে, "রাজন্! যাঁর বিক্রমাদিত্যের মতো ঔদার্যগুণ আছে তিনিই এই সিংহাসনে বসবার যোগ্য। আর কেউ নন।"

রাজা বললেন, "সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য-বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।"

পুতুল বললে, "রাজন্! শুনুন। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য সামন্ত রাজগণ কর্তৃক উপাসিত হয়ে সিংহাসনে বসে আছেন। সেই সময়ে একজন ঐন্দ্রজালিক এসে 'ব্রহ্মার মতো আয়ুষ্মান হোন্' এই কথা বললে। তারপর আবও বললে, 'দেব! আপনি সকল কলাবিদ্যায় পারদর্শী, বহু মহা মহা ঐন্দ্রজালিক আপনাকে ইন্দ্রজাল-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, আজ আমার ইন্দ্রজাল-নৈপুণ্য দেখুন।'

রাজা বললেন, 'এখন আমাদের সময় নেই, স্নানাহারের সময় হয়েছে, কাল সকালে দেখবো।'

তারপর পরদিন সকালে এক বিশালবপু, দীর্ঘশ্মশ্রু, উজ্জ্বলবর্ণ একটি পুরুষ, কাঁধে খড়্গ, একটি সুন্দরী স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে রাজসভায় এসে রাজাকে প্রণাম করলো।

সভার রাজপুরুষেরা তাই দেখে তাকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নায়ক! তুমি কোথা থেকে আসছো?'

সেই পুরুষ বললে, 'আমি দেবেন্দ্রের পরিচারক। কোন সময়ে

প্রভু' আমাকে অভিসম্পাত করায় আমি ধরাতলে বাস করছি। এইটি আমার স্ত্রী। সংপ্রতি দানবদের সঙ্গে দেবতাদের ঘোর যুদ্ধ

সেই পুরুষ বললে, 'আমি দেবেন্দ্রের পরিচারক '

বেধেছে। সেজন্যে আমি সেখানে যাচ্ছি। এই বিক্রমাদিত্য পরস্ত্রীদের সহোদর ভ্রাতার মতো। এই কথা বিবেচনা করে আমার স্ত্রীকে তাঁর জিম্মায় রেখে যাচ্ছি।'

এ কথা শুনে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। সেই লোকটিও নিজ স্ত্রীকে রাজার জিম্মায় রেখে খড়্গে ভর দিয়ে আকাশে উঠলো। যেমন সে শূন্যে উঠলো অমনি আকাশে 'মার্ মার্' শব্দ হতে লাগলো। সভার সকলে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে কৌতুকের সঙ্গে দেখতে লাগলো।

ক্ষণিক পরেই আকাশ থেকে সভাতলে একখানি রক্তাক্ত হাত পড়লো। হাতে রয়েছে খড়্গ।

তাই দেখে সকলেই বললে, 'হায়! এই স্ত্রীলোকটির বীরপতিকে শত্রুপক্ষ কেটে ফেলেছে। তারই একখানি হাত ও খড়্গ এসে সভায় পড়েছে।'

সকলে যখন এই রকম বলাবলি করছে তখন সেই বীরের ছিন্নমুণ্ড ও মুণ্ডহীন দেহ এসে সভায় পড়লো।

তাই দেখে সেই বীরপত্নী বললে, 'দেব! আমার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে শত্রুর হাতে নিহত হয়েছেন। তাঁর মুণ্ড, হাত, মুণ্ডহীন দেহ ও খড়্গ সভায় পড়েছে। অতএব দিব্যবালারা আমার প্রিয়পতিকে বরণ করবে। স্বামীর জন্যই আমার দেহ ধারণ : তিনি যখন মারা গেছেন তখন কার জন্য বেঁচে থাকবো?...শাস্ত্রে বলে, পতিহীন নারীর জীবন বিফল। যে নারী পতিহীনা তাকে দীনা ও শোচনীয়া বলা যায়। তার প্রাণধারণে কি ফল?... বৈধব্যের মতো কষ্টকরও আর কিছু নয়। পতির সামনে যে নারীর মৃত্যু হয় তার মতো পুণ্যবতী আর কেউ নেই।

এই বলে সেই স্ত্রীলোকটি সহমরণে যাবার জন্য রাজার পাদমূলে পতিত হলো। রাজা তখন চন্দনকাষ্ঠাদি দিয়ে চিতাসজ্জা করিয়ে রমণীকে সহমরণের আদেশ দিলেন। সেই সতী নারীও রাজার আদেশ পেয়ে পতির মৃতদেহের সঙ্গে অগ্নিতে প্রবেশ করলো।

তারপর সূর্য অস্ত গেল। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করে সিংহাসনে বসলে সামন্ত ও মন্ত্রিগণ তাঁকে ঘিরে বসলেন। সেই সময়ে সেই বিশালকায় নায়ক আগের মতোই খড়্গ হাতে এসে রাজার গলায় পারিজাতের মালা পরিয়ে দিয়ে যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। তাই দেখে সভার সকলেই স্তম্ভিত।

নায়ক বললে, 'রাজন! আমি এখান থেকে দেবপুরে গেলে

দানবদের সঙ্গে ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধে। অনেক রাক্ষস তাতে বিনষ্ট হয়, অনেকে পালায়। সংগ্রাম শেষ হলে দেবরাজ প্রসন্ন হয়ে আমাকে বললেন, 'নায়ক! তুমি আর ধরাতলে যেও না। তুমি অভিশাপ থেকে মুক্ত হলে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হলাম। এই বলয় নাও।' এই বলে নিজহাতে রত্নখচিত মুক্তাবলয় খুলে আমাকে দান করলেন। আমি আবার তাঁকে বললাম, 'প্রভো, আমার পত্নীকে রাজা বিক্রমাদিত্যের জিম্মায় রেখে এসেছি, তাকে নিয়ে শীঘ্রই আসছি।' দেবরাজকে এই বলে আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি।

আপনি পরস্ত্রীদের সহোদরের মতো। এখন আমার স্ত্রীকে দান করুন। তাঁকে নিয়ে আবার স্বর্গে যাবো।'

এই কথা শুনে রাজা ও সভার সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত ও নীরব হয়ে রইলেন।

তখন সেই নায়ক আবার রাজাকে সম্বোধন করে বললেন, 'রাজন্! আপনি নীরব আছেন কেন?'

রাজার পাশের লোকেরা বললে, 'তোমার স্ত্রী আগুনে প্রবেশ করেছে।'

সে বললে, 'কেন?'

তাই শুনে সভার সকলে নীরব হয়ে রইলো।

লোকটি রাজাকে বললে, 'হে রাজশিরোমণি! আপনি ব্রাহ্মার মতো আয়ুষ্মান হোন্। আমি একজন ঐন্দ্রজালিক। আপনার সামনে ঐ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার নিপুণতা প্রদর্শন করলাম!'

রাজা বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হলেন। তখন কোষাধ্যক্ষ এসে বললেন, 'রাজন্! পাণ্ড্যরাজ প্রভুর কাছে কর পাঠিয়েছেন।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কি পাঠিয়েছেন?'

কোষাধ্যক্ষ বললে, 'দেব! মন দিয়ে শুনুন। আটকোটি স্বর্ণ, তিরানব্বই কোটি মুক্তাভার, মদগন্ধলুব্ধ-মধুকরবেষ্টিত পঞ্চাশটি হাতী, তিন শ' ঘোড়া ও চার শ' স্ত্রীলোক।'

রাজা বললেন, 'এই সমস্তই এই ঐন্দ্রজালিককে দান কর।'

তখন সেই সমস্তই ঐন্দ্রজালিককে দান করা হলো।"

পুতুল এই কাহিনী বর্ণনা করে ভোজরাজকে বললে, "রাজন্! যদি আপনারও এই রকম উদারতা থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন

রাজা অধোবদনে রইলেন
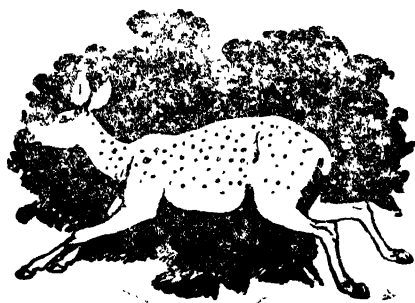
একত্রিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসবার উপক্রম করলেন। তখন অন্য পুতুল বললে, "রাজন্! বিক্রমাদিত্যের মতো যাঁর ঔদার্যাদি গুণ আছে, তিনিই এই সিংহাসনে বসবার যোগ্য।"

রাজা বললেন, "সেই বিক্রমাদিত্যের ঔদার্যাদি গুণ বর্ণনা করো।"

পুতুল বললে, "রাজন! শুনুন। বিক্রমাদিত্য যখন রাজ্যশাসন করছেন তখন একদিন এক দিগম্বর এসে তাঁর হাতে একটি ফল দান ও তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'রাজন্! আমি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিনে শ্মশানে হোম করবো। আপনাকে আমার উত্তর সাধক হতে হবে। আপনি পরোপকারী ও সত্ত্বগুণ সম্পন্ন। সেই শ্মশানের কাছে একটি শমীবৃক্ষ আছে। তার উপর এক বেতাল থাকে। আপনি মৌনভাবে তাকে নিয়ে যাবেন।'

রাজা 'তাই করবো' বলে প্রতিজ্ঞা করলেন।

তারপর দিগম্বর কৃষ্ণা চতুর্দশী দিনে শ্মশানে দ্রব্যসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হলেন। যে শমীবৃক্ষে বেতাল ছিল তা দেখিয়ে দিলে রাজা বিক্রমাদিত্য তাকে কাঁধে নিয়ে যখন যাচ্ছেন তখন বেতাল তাঁকে বললে, 'রাজন্! কোন কাহিনী বর্ণনা করুন। তাহলে পথকষ্ট দূর হবে।'

মৌন ভঙ্গ হবে এই ভয়ে রাজা নীরব রইলেন।

বেতাল আবার বললে, 'আপনি মৌন ভঙ্গ হবে এই ভয়ে কথা কইছেন না। যা হোক আমিই গল্প বলি। আমার কথা শেষ হলে যদি কোন কথা বলেন, আপনার মাথা হাজার ভাগে ভেঙে যাবে।' এই বলে বেতাল গল্প আরম্ভ করলো :

রাজন্! শুনুন। হিমালয়ের দক্ষিণদিকে বিন্ধ্যবতী নামে এক নগর আছে। সেখানে সুবিচারক নামে রাজা বাস করতেন। তাঁর

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমি কি তোমার পোষ্য যে তোমার ঘোড়া ধরবো ?'

পুত্র ময়সেন। ময়সেন একদিন মৃগয়ার জন্য বনে গেলেন। বনে তিনি একটি হরিণ দেখামাত্র তার অনুসরণ করতে করতে মহারণ্যে প্রবেশ করলেন। সেখান থেকে একটি নগরের পথে একা আসতে

আসতে একটি নদী দেখতে পেলেন। সেই নদীতীরে এক ব্রাহ্মণ একটি অনুষ্ঠান করছিলেন।

রাজপুত্র ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ! আমি যতক্ষণ জল পান করি ততক্ষণ আমার ঘোড়াটি ধরুন।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমি কি তোমার পোষ্য যে ঘোড়া ধরবো?'

তাতে কুমার ব্রাহ্মণকে চাবুক মারলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করলেন।

রাজাও চক্ষু রক্তবর্ণ করে কুমারকে নির্বাসনের আদেশ দিলেন।

তখন মন্ত্রী বললেন, 'রাজকুমার রাজভোগের যোগ্য, নির্বাসনের যোগ্য নয়। কাজেই এমন কাজ করা অনুচিত।'

রাজা বললেন, 'হে মন্ত্রি! এই কাজই করা উচিত। যেহেতু রাজকুমার ব্রাহ্মণকে চাবুক মেরেছে, এই তার উচিত শাস্তি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখন ব্রাহ্মণের হিংসা করে না। শাস্ত্রে বলে, বিষসেবন, সাপের সঙ্গে খেলা, যোগিগণের নিন্দা ও ব্রাহ্মণের হিংসা করবে না। ব্রাহ্মণগণ সর্বদা পূজনীয়। আমার পুত্র যে হাতে দিয়ে ব্রাহ্মণকে চাবুক মেরেছে, সেই হাত কেটে ফেল।'

রাজা এই কথা বলে নিজেই কুমারের হাতখানা কাটতে উদ্যত হলেন অমনি সেই ব্রাহ্মণ গিয়ে বললেন, 'কুমার যখন অজ্ঞানতা বশে এই কাজ করেছেন তখন এমন কাজ করা অনুচিত, আমার অনুরোধে তাঁকে রক্ষা করা উচিত। আমি প্রসন্ন হয়েছি।'

এই কথা শুনে রাজা স্বপুত্রকে ক্ষমা করলেন। ব্রাহ্মণও নিজগৃহে চলে গেলেন।

বেতাল এই কাহিনী বর্ণনা করে বললেন, 'রাজন! এই দুজনের মধ্যে গুণে শ্রেষ্ঠ কে?'

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, 'রাজাই গুণে শ্রেষ্ঠ।'

বেতাল এই কথা শুনে রাজার মৌন ভঙ্গ হওয়ার কারণে আবার

শমীবৃক্ষে চলে গেল। রাজাও সেখানে গিয়ে আবার তাকে কাঁধে করে আনলেন।

পথে আসতে আসতে বেতাল আবার গল্প আরম্ভ করলো।

এইভাবে বেতাল পঁচিশটি উপাখ্যান বললো। বিক্রমাদিত্যের সূক্ষ্মবুদ্ধি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বেতাল তাঁকে বললে, 'রাজন! এই দিগম্বর আপনাকে বধ করবার চেষ্টা করছে।'

রাজা বললেন, 'কেমন করে?'

বেতাল বললে, 'আপনি আমাকে যখন দিগম্বরের কাছে নিয়ে যাবেন তখনই আপনার পরাজয় ঘটবে। 'তুমি ক্লান্ত হয়েছো, এখন অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে স্বস্থানে প্রস্থান কর'—সে এই কথা বললে আপনি যখন সাষ্টাঙ্গে প্রণামের জন্য অবনত হবেন অমনি দিগম্বর খড়্গ দিয়ে আপনাকে বধ করবে। তারপর আপনার দেহমাংস দিয়ে হোম করবে। তা করলেই সে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করবে।'

বিক্রমাদিত্য বললেন, 'এখন কি কর্তব্য?'

বেতাল বললে, 'আপনি এই করুন। সন্ন্যাসী যখন বলবে, 'নমস্কার করে স্বস্থানে প্রস্থান কর।' তখন আপনি বলবেন, 'আমি সার্বভৌম নৃপতি, সকল রাজাই আমাকে প্রণাম করেন, আমি কখনো প্রণাম করি নি। কাজেই প্রণাম করতে জানি না। তুমি প্রথমে দেখিয়ে দাও, কি করে প্রণাম করতে হয়। তাই দেখে আমি পরে প্রণাম করবো।' তখন সে প্রণাম করবার জন্য যেমনি নিচু হবে অমনি আপনি তার মুণ্ডচ্ছেদ করবেন।

তখন আমি কোন প্রকার আপনাকে বাধা দেবো না। এ রকম করলেই আপনার অষ্টসিদ্ধি লাভ হবে।'

বেতাল এই কথা বললে, বিক্রমাদিত্য সেই রকম কাজই করলেন। তাঁর অষ্টসিদ্ধি লাভ হলো।

তখন বেতাল বললে, 'রাজন্! আমি আপনার প্রতি প্রসন্ন হলাম। বর প্রার্থনা করুন।'

রাজা বললেন, 'যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাক, তবে যখন আমি তোমাকে স্মরণ করবো, তখন আমার কাছে উপস্থিত হবে।'

বেতাল তাই করতে প্রতিজ্ঞা করে স্বস্থানে চলে গেল। রাজাও নিজ নগরে ফিরে এলেন।"

এই কাহিনী বর্ণনা করে পুতুল বললে, "রাজন্! আপনার যদি এই রকম ঔদার্যগুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"
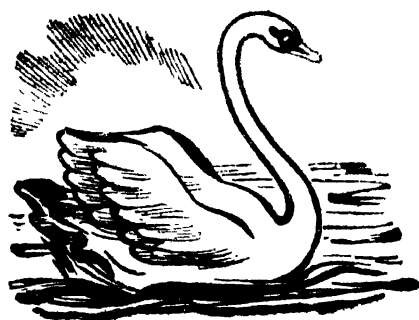
রাজা নীরব রইলেন।

দ্বাত্রিংশ উপাখ্যান

ভোজরাজ আবার সিংহাসনে বসবার উপক্রম করলে, শেষ পুতুল বললে, "রাজন্! এই সিংহাসনে একমাত্র বিক্রমাদিত্যই বসবার যোগ্য। আর কেউ নয়। তাঁর সমান রাজা পৃথিবীতে নেই। তিনি সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করে কাঠের খড়্গ দিয়ে রাজগণকে পরাস্ত করে একচ্ছত্র রাজ্য করেছিলেন। তিনি পরের শঙ্কা দূর করে নিজকে বিপদে ফেলতেন। পৃথিবীতে যেখানে যত রাজা আছেন তাঁদের প্রতি বশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ করে তাঁদের সকলকেই বশ করেছিলেন। তিনি রাজ্য থেকে সমস্ত দুর্বৃত্তকে নির্বাসিত করে প্রার্থিগণের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষকষ্ট দূর করে পৃথিবী শাসন করেন। কাজেই তাঁর সমান রাজা আর নেই। যদি আপনাতে সেই রকম ঔদার্যাদি গুণ থাকে তবে এই সিংহাসনে বসুন।"

এই কথা শুনে ভোজরাজ নীরব রইলেন।

সেই দ্বাত্রিংশ পুতুল আবার বললে, "রাজন্! বিক্রমাদিত্য সেই রকমই উদার ছিলেন। আপনিও সামান্য নন। আপনারা উভয়েই নরনারায়ণের অবতার স্বরূপ। আপনার মতো পূতচরিত্র, সকল কলাবিশারদ, উদার রাজা একালে আর নেই। আপনার প্রসাদে আমাদের বত্রিশটি পুতুলের পাপক্ষয় হলো। আমরা শাপ থেকে মুক্তি লাভ করলাম।"

ভোজরাজ বললেন, "তোমাদের শাপবৃত্তান্ত বর্ণনা কর।"

পুতুল বললে, "রাজন্‌! শুনুন। আমরা বত্রিশ জন সুরবালা পার্বতীর সখী ছিলাম। আমরা তাঁর পরম প্রণয়পাত্রী। আমাদের সকলের নাম শুনুন—মিশ্রকেশী, প্রভাবতী, সুপ্রভা, ইন্দ্রসেনা, সুদতী,

ভোজরাজ বললেন, "তোমাদের শাপবৃত্তান্ত বর্ণনা কর।"

অনঙ্গনয়না, কুরঙ্গনয়না, লাবণ্যবতী, কামকলিকা, চণ্ডিকা, বিদ্যাধরী, প্রজ্ঞাবতী, জনমোহিনী, বিদ্যাবতী, নিরুপমা, হরিমধ্যা, মদনসুন্দরী, বিলাসরসিকা, শৃঙ্গারকলিকা, মন্মথসঞ্জীবনী, রতিলীলা, মদনবতী,

চিত্ররেখা, সুভগা, প্রিয়দর্শনা, কামোন্মাদিনী, সুখসাগরা, শশিকলা, চন্দ্ররেখা, হংসগামিনী, রসবতী ও উন্মাদিনী।

একদিন মহেশ্বর সিংহাসনে বসে আমার দিকে প্রেমদৃষ্টি দান করলেন। তাই দেখে দেবী পার্বতী সরোষে আমাদের এই বলে অভিশাপ দিলেন, 'তোমরা নির্জীব পুতুল হয়ে ইন্দ্রের সিংহাসনে সংলগ্ন থাক।'

তখন আমরাও প্রণিপাত করে শাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা করলাম।

তাতে দেবী বললেন, 'সেই সিংহাসনে রাজা বিক্রমাদিত্যের বসবার পর তা যখন ভোজরাজের হাতে আসবে তখন তোমাদের বত্রিশজনের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হবে। তোমাদের মুখে ভোজরাজ যখন বিক্রমাদিত্যের চরিত্র-কথা শুনবেন তখনই তোমাদের শাপমোচন হবে।'

তারপর ভোজরাজের অনুমতি নিয়ে পুতুলেরা স্বস্থানে চলে গেল। তখন ভোজরাজ সেই সিংহাসনের উপর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেবীর অষ্টদলে প্রতিষ্ঠিত উমা-মহেশ্বরের মূর্তি স্থাপন করে প্রত্যহ ষোড়শোপচারে পূজা করতে লাগলেন।

এইভাবে বর্ণাশ্রম-ধর্মনিরত লোকদের পালন করে ভোজরাজ পৃথিবী শাসন করেছিলেন। তাঁর দেবপূজা ও স্তুতিবাদে দেবী পার্বতী পরম পরিতুষ্ট হয়েছিলেন।

সমাপ্ত